শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

প্রলোভন

প্রকাশক

শ্রীছেদীলাল আগরওয়ালা

২৩ নং মুক্তারামবাবুর চতুর্থ লেন

কলিকাতা

মূল্য ১৲ টাকা

সুপরিচিত সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রনাথ পাল

প্রিয় বড়দা !

"প্রলোভন" বাহির হইল। এ "প্রলোভন" তোমারই নাম সংস্পর্শে উপন্যাস প্রিয় পাঠকপাঠিকার একমাত্র প্রলোভন হউক। ইতি :—

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ সাল,
কলিকাতা।

স্নেহাস্পদ
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

আর একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর নূতন উপন্যাস

রসিক

(যন্ত্রস্থ)

অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রলোভন

--:-✲-:--

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ জীবনটা যেন একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ নাই,—শুধু অবসাদ, আর শুধু হাহাকার। জীবনে কোন একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে, জীবনটা যে এমন একটা অসার বিকট হইয়া দাড়ায় তাহা আজ আমি নিজের প্রাণটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া যতটা বুঝিতেছি এতটা বোধ হয় বুঝিবার সুযোগ ও সুবিধা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পৃথিবীর নির্ম্মল আলোর ভিতর দিয়া শৈশবে যখন আমার জীবনটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন আমার ছিল না কি? পৃথিবীতে মানুষের যাহা যাহা থাকিলে, মানুষ মানুষকে সৌভাগ্যবান পুরুষ বলিয়া জগতে ঘোষণা করে আমার তাহার সকল কয়টাই ছিল। স্নেহময় পিতা,—স্নেহময়ী মাতা,—জ্যাটা,—খুড়া,—দিদিমা,—দাদা মহাশয়,—ধন সম্পত্তি আমার কিছুরই অভাব ছিল না। তখন জীবনে কত আশা কত উদ্যম, প্রাণের ভিতর নিত্য নূতন ভাবের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়া

এ হৃদয়ে সোনালী আলো জ্বালিয়া ধরিত,—কিন্তু এখন আর সে আশা নাই,—সে উৎসাহ নাই,—সবই শূন্য,—সবই ফাঁকা,—সমস্ত জীবনটা, যেন একটা ভরাট অন্ধকার।

কেমন করিয়া আমার এমন জীবনটা এমন অসার হইয়া পড়িল,—আজ বহু দিন পরে তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। তোমরা কি শুনিবে? শোনা উচিত। শুনিলে,—বুঝিলে আমার মত আর তোমাদের জীবনটা এমন অসার হইয়া পড়িবে না। অসার জীবন বহন করা সে যে কি কষ্টজনক তাহা তো তোমরা বুঝিবে না। আর কেমন করিয়াই বা বুঝিবে,—তোমরা সংসারে থাকিয়া স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন লইয়া সুখে হউক,—দুঃখে হউক,—অভাবে হউক,—দৈন্যে হউক নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতেছ,—ভগবানের প্রীতি নিরন্তর তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে তাহাতে তোমরা যে শান্তিলাভ করিতেছ তাহা আমার ভাগ্যে কোন দিন ঘটে নাই,—আর কোন দিন ঘটিবেও না। পৃথিবীতে আসিয়া আমার মনে হয় না যে আমি আজ পর্য্যন্ত কোন কর্ত্তব্য করিয়াছি, ভগবানের দান এমন প্রাণটা যে বৃথায় নষ্ট করিয়া দিলাম এইটুকু যখন আমি ভাবি তখন একটা তীব্র বেদনায় আমার নয়নপল্লব অশ্রুজলে আপনা হইতেই ভারি হইয়া উঠে। মনে হয় যেন এই শূন্য হৃদয়টা বিদীর্ণ হইয়া মহাশূন্যে মিলিত হয়।

প্রলোভন।

আপনার বলিবার মত পৃথিবীতে আমার কিছুই নাই। এত বড় একটা প্রকাণ্ড পৃথিবীতে আমি একেবারে সম্পূর্ণ একা, থাকিবার মধ্যে আছে আমার কেবল এক রাশ অর্থ। অর্থের ব্যয় করিবার পাত্র না থাকিলে সে অর্থের মূল্য কি? কাজেই আমার এ পৃথিবীতে থাকাও যা না থাকাও তাহাই। যখন আমি আমার এই অসার জীবনের মেয়াদ শেষ করিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিব তখন এক ফোঁটা অশ্রুও কাহারও নয়ন হইতে পড়িয়া আমার মহা যাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে না। আমি নীরবে চক্ষু মুদিব। এই একটা আসার দেহের বহন ভার হইতে রক্ষা পাইয়া পৃথিবীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। প্রাণ এ কাটাম হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর এই কাটামখানার অবস্থাটা কি হয় সেটা একটু জানিবার বড় কৌতুহল হয়। এটা পুড়িবে না কবরে যাইবে সে কেবল জানেন তিনি, যাহার নিকট কিছুই গোপন থাকে না।

আমার মনে পড়ে আমার পিতা যখন মারা যান তখন আমার বয়স দশ বৎসর। জননীর নিকট পুত্র যে কি বস্তু সেই দিন প্রথম বুঝিলাম। মা আমার অত বড় শোকটা আমাকে বুকে ধরিয়া সামলাইয়া লইলেন। সে শোকের আমিই হইলাম তাঁহার শান্তি প্রলেফ। আমি তখন গ্রামের স্কুলে পড়িতাম,—স্কুলে লেখা পড়া সম্বন্ধে মাষ্টার মহলে আমার বেশ একটু সুখ্যাতি ছিল।

পিতার মৃত্যুতে আমার একমাস স্কুল বন্ধ হইল। এক মাস কাটিবার পর শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে আমি আবার স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলাম। পিতার মৃত্যুটা তখন আমার নিকট বিশেষ কিছু একটা গুরুতর জিনিষ বলিয়া বোধ হয় নাই। তাঁহার জন্য বিশেষ যে কোন একটা শোক পাইয়াছিলাম তাহাও বলিয়া মনে হয় না। যাহার অভাবে মানুষের প্রাণে শোকটা বেশী করিয়া লাগে পিতা আমাদের সে অভাবটা একেবারেই রাখিয়া যান নাই। আমার মনে হয় পিতৃ-বিয়োগটা দরিদ্রের সন্তানেরা যে ভাবে অনুভব করে ধনীর সন্তানেরা সে ভাবে অনুভব করিতে পারে না। নিজের স্বার্থ ও ক্ষতির উপর লোকের শোক দুঃখের গুরুত্ব নির্ভর করে। ধনীর সন্তানদিগের স্বার্থ ও ক্ষতির হিসাবে পিতৃ-বিয়োগটা দরিদ্রের সন্তানদিগের তুলনায় কিছুই নহে, কাজেই তাহারা পিতৃ-বিয়োগটা বিশেষ যে কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার তাহা তাহারা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে পারে না। আমি ধনীর সন্তান, পিতা সর্ব্ব দুঃখহারী আমার জন্য এক রাশ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন,—কাজেই পিতৃ-বিয়োগ জনিত শোকটা আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে পারি নাই। আমার দিনগুলি যে ভাবে কাটিয়া আসিতে ছিল পিতার মৃত্যুর পরও ঠিক সেই ভাবেই কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিন চারি বৎসর কালের কোলে গড়াইয়া গেল। আমার বয়সটাও বেশ একটু

ভারি হইয়া উঠিল। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম। ওষ্ঠের উপর সামান্য কালো কালো গোপের রেখা দেখা দিল, স্বরটাও বেশ একটু ভারি হইয়া উঠিল। দেহটাও যেন গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল। কিশোরের নূতন বাতাস আমার সমস্ত দেহটার উপর দিয়া যৌবনের সুগন্ধ ছড়াইয়া নূতন ভাবে বহিতে লাগিল। প্রাণের ভিতর আশার রঙ্গিন তুলিতে আঁকা নূতন নূতন ছবি ভাসিয়া উঠিয়া তখন আমার সমস্ত ভবিষ্যৎটা আশায় আলোয় যেন একেবারে উজ্জ্বল করিয়া দিল।

গ্রামে আমাদের যে স্কুলটা ছিল,—সেটা বাঙ্গালা স্কুল। তখন আমি তাহার গণ্ডী পার হইয়া ছিলাম কাজেই বাড়ীতে আমার লেখা পড়ার বিষয় লইয়া বেশ একটু আলোচনা চলিতে লাগিল। আমার লেখা পড়াটা এইবার সদরে হইবে না কলিকাতায় হইবে আলোচনার বিষয়টা ছিল তাহাই। মায়ের সহিত খুড়া মহাশয়ের এ বিষয়ে কয়েক দিন ধরিয়া নানা কথাবার্ত্তা হইবার পর শেষ যাহা রায় বাহির হইল তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—আমাকে আগামী মাসের প্রথমেই কলিকাতা রওনা হইতে হইবে ও সেখানে কোন এক সুবিধা জনক মেসে থাকিয়া আমি লেখা পড়া শিখিব। কিন্তু কিছুদিন পরে সে রায়ের আবার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন হইল। আমি জননীর একমাত্র সন্তান। আমার দেহটা যে মেসে থাকিবার একেবারেই অনুপযুক্ত কলিকাতায় রওনা

হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে জননীর চক্ষে তাহা ধরা পড়িয়া গেল। কাজেই আমার আর মেসে থাকা হইল না,—কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া আমি আবার নূতন পড়া আরম্ভ করিলাম। দেশ হইতে আমাদের এক বহু পুরাতন ভৃত্য আমার অভিভাবক হইয়া আমার সঙ্গে আসিল। আমি কলিকাতায় বহুবাজারে একটা ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়া খুব জোড়ের সহিত লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া দিলাম। খুড়া মহাশয় আমার সঙ্গে আসিয়া ছিলেন, তিনি আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। আমি নূতন সহরে, নূতন সহপাঠিদিগের সহিত আবার নূতন পড়া পড়িতে লাগিলাম।

পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া আমার প্রথম প্রথম কেমন যেন সব নূতন নূতন ঠেকিতে লাগিল। আমার মনে হইল সমস্ত কলিকাতা সহরটা যেন একটা গোলকধাঁধাঁ। পুকুরের মাছকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন প্রথম প্রথম একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়ে আমিও সেইরূপ কলিকাতায় আসিয়া তাহার জাকজমক চাকচিক্য দেখিয়া একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহা অতি অল্প দিনের জন্য। দুই চারি বৎসর কলিকাতায় থাকিবার পর আর আমার কাছে কিছুই নূতন ঠেকিল না। কলিকাতার কলের জল ও বালাম চাউল কিছুদিন উদরে প্রবেশ করিলেই মানুষ একে-

বারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ভিতরে পূর্ব্বে যে মানুষটা ছিল সে যেন একজন নূতন মানুষের উপর সমস্ত ভার দিয়া তাহার নিজের বাসস্থান পল্লী-জননীর শান্তিকুঞ্জে ফিরিয়া যায়,—কাজেই সহরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবভঙ্গি চাল চলন সমস্তই উল্টাইয়া যায়। আমারও তাহাই হইল। আমিও সহরের আবহাওয়ার ভিতর দিয়া ক্রমেই সহুরে হইয়া পড়িতে লাগিলাম। সহরের শত প্রলোভন আসিয়া আমাকে চারিদিক হইতে নানা মূর্ত্তিতে প্রলোভিত করিতে লাগিল। নানা ভাবের নানা বন্ধু জুটিল,—থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখাও আরম্ভ হইল,—কিন্তু তাহা হইলে, কি হয় কোন, প্রলোভনই আমাকে একেবারে গ্রাস করিতে পারিল না। লেখা পড়ায় আমার কোন দিনই গাফিলী ছিল না,—কলিকাতায় আসিয়াও শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও আমি রীতিমত লেখাপড়া শিখিতে লাগিলাম। যথা সময়ে সসম্মানে প্রবেশিকা ও ফাষ্টটাড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। ফাষ্টটার্ড পরীক্ষার সংবাদটা খুড়া মহাশয়ের নিকট যে দিন যাইয়া উপস্থিত হইল সে দিন তিনি নাকি খুব খানিকটা হাসিয়া আমার জননীকে বলিয়াছিলেন, "যাহ'ক কলিকাতায় গিয়া ছোড়াটা একটু বাবু হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তাহ'ক ছোড়ার লেখাপড়ার খুব চাড় আছে। না ছেলেটার ভাল হবে,—ক'রে খেতে পার্ব্বে।"

হয়তো খুড়ার ভবিষ্যৎ বাণীটা ফলিলেও ফলিতে পারিত, কিন্তু ভগবান বিমুখ,—আমার অদৃষ্টে শান্তি নাই,—আমি কেমন করিয়া শান্তি পাইব। সূতিকা গৃহে বিধাতার কলম হইতে যে অখণ্ড সত্য বাহির হয় তাহাতো মিথ্যা হইবার নহে! তাহা কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে। ফ্রাষ্টটার্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর একবার আমি দেশে আসিলাম। কিন্তু দেশে অধিক দিন থাকিতে পারিলাম না,—দেশে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতির অনুচরদিগের আনাগোনা দিন দিন এমনই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যে আমায় একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় বাটী হইতে বাহির হইতে না পারিয়া একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়া সময় কাটাইতে ছিলাম, সেই সময় মা সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "নীরু, তোর খুড়া মশাই তোর জন্যে আজ একটী পাত্রী দেখে এসেছেন, তিনি বল্‌লেন তুইও না হয় এক দিন দেখে আয়। মেয়েটা যদি ভালো হয় ওইখানেই তোর আমি বিয়ে দেব। এ মাসে না হ'লে আবার সাম্‌নের তিন মাস অকাল,—হবে না।"

জননীর কথায় অবাক্ হইয়া আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। বিবাহ! সে কি! সর্ব্বনাশ! এই বিবাহ করিয়াই আজ সমস্ত বাঙ্গালায় এত হাহাকার, এত দুর্ভিক্ষ। তখন আমার দেহের রক্তের ভিতর বি, এ, পাড়ার নূতন তেজ প্রবাহিত হইতেছে। আমি কি বিবাহ করিতে পারি! হায় তখন যদি

জননীর অবাধ্য না হইয়া বিবাহে সম্মতি দিতাম, তাহা হইলে আজ আর এমন শূন্য হৃদয় লইয়া,—ভারবহ জীবনটা এমন ভাবে বহিতে হইত না। আমার মনে হয় তাস খেলায় যেমন একবার একটা ভুল হইলেই পড়তা ঘুরিয়া যায়, সেইরূপ জীবনেও একবার একটা ভুল হইলেই সমস্ত জীবনটা একেবারে পণ্ড হইয়া যায়। উত্তরের অপেক্ষায় জননী আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, আমি কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে অবাক ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, "সে কি,—এর মধ্যে বিয়ে কি মা? এই জন্যেইতো আমাদের এত দুর্দ্দশা। লেখাপড়া শেষ না হ'তেই,—রোজকারের কোন পথ না করেই অমনি আমাদের দেশের লোক একটা বিয়ে করে বসে কিন্তু কি যে খাওয়াবে তার কোন ঠিক নেই। কাজেই চির জীবনটা হাহাকার করে মরে। মা বিয়ে করবার সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না,—আর আমাদের দেশে মেয়েরও অভাব নেই। দাঁড়াও আগে লেখা পড়াটাই শেষ হ'ক তবে তো বিয়ে। না মা এখন আমার বিয়ে করা কিছুতেই চল্‌বে না।"

দুইটা পাশ করা কলিকাতাবাসী ছেলের এত বড় একটা প্রকাণ্ড বক্তিতার উপর প্রতিবাদ করা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মায়ের আমার সাধ্যে কুলাইল না;—তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার মুখখানি বরাবর মলিন দেখিয়া

আসিতেছিলাম, আজ তাহাতে একটুমাত্র আনন্দের রেখা পড়িয়াছিল, কিন্তু আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা আরও যেন মলিন হইয়া গেল। মায়ের সেই মুখখানির দিকে চাহিবামাত্র আমার ভিতরের মানুষটা কেমন যেন একবার নাড়া চাড়িয়া উঠিল; কিন্তু আমি সেটা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কথাটায় আর একটু জোর দিয়া বলিলাম, "মা বিয়েটা যখন তখন না বুঝে করা কোন মানুষেরই উচিত নয়। যে পর্যান্ত না মানুষ নিজেকে বিয়ে ক'রবার উপযুক্ত করে তুলতে পারে তত দিন তার কিছুতেই বিয়ে করা উচিত নয়। এই না বুঝেসুঝে আমাদের দেশের মানুষগুলো বিয়ে ক'রে কি কষ্টটাই না পাচ্চে? নিজেতো কষ্ট পাচ্চেই, সঙ্গে সঙ্গে পরের মেয়েকে এনে তাকে না দিতে পারে খেতে, না পারে তার অভাব মেটাতে। আমাদের দেশের মানুষগুলোর এই বিয়ে করা রোগটা যত দিন না ঘুচ্‌বে তত দিন আমাদের দেশের উন্নতি হতেই পারে না।"

মা আমার এ জটিল সমস্যার মীমাংসার ভিতর দিয়াই গেলেন না, তিনি বেশ শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, "তা তোর যদি এখন বিয়ে ক'রবার মত না থাকে এর পরই করিস্। আমি ছোট ঠাকুরপোকে সেই কথাই বল্‌বো অখন।"

জননী আবার ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি আবার সেই উপন্যাসখানা খুলিয়া বসিলাম। জননী

সেইদিন হইতে আমার বিবাহ সম্বন্ধে নীরব হইলেন বটে কিন্তু প্রজাপতির পক্ষ সঞ্চালন তখনও বন্ধ হইল না। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া আসিয়া কেবলই আমার ললাটে বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি তাহার অত্যাচারে মহা বিরক্ত হইয়া কলেজ আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই কলিকাতায় যাত্রা করিলাম ও যথা সময়ে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া মহা তোড়ের সহিত আবার বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কলিকাতার সমস্ত প্রলোভনকে জয় করিয়া তখন আমি অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। কলেজে ও আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত আমি মহা হুসিয়ার,—আমার বুদ্ধিটা বড়ই তীক্ষ্ণ, মনের জোরও অসম্ভব। আমার হৃদয় টলান বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমারও মনে মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে আমি বড়ই বুদ্ধিমান,—কোন প্রলোভনই আমায় কিছুতেই দমাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক দিন কলেজে গিয়া শুনিলাম, কাল মাহেশের উল্‌টা রথ। আমাদের কয়েক বন্ধুতে পরামর্শ হইল কাল আমরা মাহেশে উল্‌টা রথ দেখিতে যাইব। যেমন কথা তেমনি কাজ। পরদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর আমরা তিন চারি জন বন্ধু মিলিয়া মাহেশে উল্টা রথ দেখিতে রওনা হইলাম। আমরা যখন মাহেশে রথতলায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম তখন তথায় লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। লোকের ভীড়ে নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। ভীড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাদের যেন দম্ বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। আমরা সেই জনপ্রবাহ ঠেলিয়া কোনক্রমে ধাক্কায় ধাক্কায় একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু সহসা সম্মুখ হইতে এমন একটা বড় ধাক্কা আসিয়া আমাদের উপর পড়িল যে আমরা পরস্পর ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম। ভীড়ের ভিতর কে কোথায় যাইয়া পড়িল কাহার কোন সন্ধান রহিল না। সহসা ধাক্কা খাইয়া আমি পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যাইয়া যখন চাহিয়া দেখিবার একটু অবসর পাইলাম তখন আর কাহাকেও কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। কেবল আসে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে কালো কালো মাথা আমার চক্ষুর সম্মুখে কেমন যেন একটা ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিল। লোকের

ভীড় ক্রমেই বাড়িতে ছিল,—রথ টানিবার আর বড় বেশি বিলম্ব নাই। সকলেই কোন ক্রমে বহু কষ্টে সেই ভীড়ের অসংখ্য ধাক্কা হইতে নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়া দেহটাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। সকলের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি সমস্ত রথখানাকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন একেবারে হা করিয়া আছে। সহস্রাধিক লোক রথের দড়ি ধরিয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে,—হুকুম হইলেই রথের দড়িতে টান দিবে। রথের সম্মুখে শ্রীরামপুরের সব্-ডিভিসনাল অফিসর ও পুলিশ সাহেব দণ্ডায়মান। তাহাদের হুকুম ব্যতীত রথ টানিবার উপায় নাই। সহসা রথ টানিবার ইঙ্গিত স্বরূপ "গুড়ুম" করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। ও সঙ্গে সঙ্গে সেই সহস্রাধিক ব্যক্তি এক সঙ্গে রথের দড়িতে টান দিল। ঠিক সেই সময় "গেল গেল" শব্দে সমস্ত রথতলা একেবারে লক্ষ্য লোকের চীৎকারে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। আমি তখনও পর্য্যন্ত আমার হারান বন্ধুগণের অনুসন্ধানে যত দূর দৃষ্টি চলে আসে পার্শ্বে ব্যাকুল ভাবে চাহিতেছিলাম সহসা সেই "গেল গেল" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করায় আমি একেবারে চমকিত হইয়া সম্মুখে চাহিলাম। সম্মুখে চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সমস্ত দেহ একেবারে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমারই ঠিক সম্মুখে অতি নিকটে একটী বালিকা সেই অসহ্য ভীড়ের ধাক্কা সহ্য করিতে না পারিয়া একে-বারে রথের চাকার সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছে। রথের লৌহচক্র

পৈশাচিক শব্দে সেই ক্ষুদ্র বলিকার ক্ষুদ্র দেহ অবিলম্বে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সেই দৃশ্যে সমস্ত জগৎ আমার চক্ষের সম্মুখে যেন একবার দুলিয়া উঠিল। আমি আর কিছুতেই স্থির হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না,—মহাবলে দুই হস্তে সম্মুখের ভীড় ঠেলিয়া দিয়া সেই বালিকাকে রক্ষা করিতে ছুটিলাম। আমি যখন সেই প্রকাণ্ড ভীড় ঠেলিয়া বালিকার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম তখন রথ একেবারে বালিকার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—আমি এক লম্ফে যাইয়া সেই লুপ্ত চৈতন্যা বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ভীড় হইতে বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইলাম কিন্তু নিজেকে আর কিছুতেই সামলাইতে পারিলাম না, বালিকাসহ তথা হইতে পাঁচ সাত হস্ত দূরে যাইয়া উপুড় হইয়া পড়িলাম। পর মুহূর্ত্তেই রথ আমাদের পার্শ্ব দিয়া মহাশব্দে চলিয়া গেল। রথের চাকায় আমার পাঞ্জাবী বাধিয়া তাহার কিয়দাংশ তাহার সহিত ছিঁড়িয়া চলিয়া গেল। আর একটু হইলেই আমরা উভয়েই রথের তলায় পড়িয়া চূণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতাম। হায় আজ মনে পড়ে সেই দিনের কথা,—সে দিন কি কুক্ষণে সেই বালিকাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়াছিলাম,—কি কুক্ষণে মাহেশের রথ দেখিতে গিয়াছিলান, যাহাতে আমার সমস্ত জীবনটা এমন করিয়া পণ্ড হইয়া গেল। এত দিনে বুঝিতেছি যে মানুষের বুদ্ধি, বিবেচনা, শক্তির কোনই মূল্য নাই।

এমন এক এক সময় মানুষকে এমন এক এক অবস্থায় আনিয়া ফেলে সেখানে বুদ্ধি, বিবেচনা, শক্তি একেবারেই কার্য্যকরী হয় না। তাই দুর্য্যোধন এমন করিয়া সবংশে নিধন হইল। পাণ্ডবের পক্ষে স্বয়ং ভগবান জানিয়াও কই সেতো যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইতে পারিল না,—ঘটনা তাহাকে এমন স্থানে লইয়া আসিল যথায় বুদ্ধি বিবেচনা একেবারে অন্ধ। তাই বলিতে ছিলাম যাহা হইবার তাহা হইবেই,—আমার জীবনটা পণ্ড হইবে বলিয়াই ভগবান সে দিন আমাকে মাহেশের রথতলায় লইয়া গিয়াছিলেন।

আমি যখন বালিকাকে তুলিয়া লইয়া সেই জনপ্রবাহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার সর্ব্ব শরীর ঝিম্‌-ঝিম করিতেছিল। আমি একবার নিজের ও বালিকার দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম আমার বস্ত্র ও পাঞ্জাবীটার অধিকাংশ স্থানই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, রথতলার সহস্র লোকের পদধূলি আমার সর্ব্বদেহে যেন একেবারে ছাপ মারিয়া দিয়াছে। নিজের বেশের ও দেহের অবস্থা দেখিয়া আপনা হইতেই একটা বড় রকম নিশ্বাস আমার নাসিকা পথে বাহির হইয়া আসিল, আমি বিবর্ণ দৃষ্টিতে আবার বালিকার সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিলাম, সে মুখখানি ভয়ে যেন কেমন বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ঢলঢলে বড় বড় চক্ষু দুইটী হইতে ঝরঝর করিয়া ক্রমাগতই জল ঝরিয়া পড়িয়া তাহার গোলাপী গণ্ড সিক্ত করিতেছে।

আমি পলক শূন্য দৃষ্টি লইয়া বালিকার সেই অশ্রু জড়িত মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, কোন কথা আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। বালিকার সেই সুন্দর মুখখানি কেমন যেন একটা নেশার মত আমার সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিতে লাগিল।

আমাদের আসে পার্শ্বে চারিদিকে তখন শত শত লোক তামাসা দেখিবার জন্য ক্রমেই ভীড় জমাইয়া তুলিতে ছিল। সকলেই ভীড় ঠেলিয়া আমাদের একবার দেখিবার জন্য মহা ধাক্কাধাক্কী বাধাইয়াছে, ভিতরে না আসিতে পারিলে কি একটা মজার জিনিষ যেন তাহাদের জীবনে আর দেখা হইবে না। আমাদের চারি পার্শ্বের ভীড় হইতে নানা জনে নানা কথা বলিতেছিল, কেহ কেহ বলিতেছে, "ছোঁড়ার সাহস খুব।" কেহ কেহ বলিল, "আজ কালকার ছেলেদের সাহসের ভাগটা কিছু বেড়েছে।" আবার কেহ বলিল, "ছোঁড়াটা কি গোয়ার, আর একটু হলেই জন্মের মত পথ দেখা শেষ হ'য়ে ছিল আর কি।"

নানা কথা নানাদিক হইতে তখন আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে ছিল, কিন্তু সে কথা শুনিবার তখন আমার ইচ্ছা বা কৌতুহল মোটেই ছিল না। তাহা ছাড়া এই অদ্ভুত মূর্ত্তি লইয়া সেই ভীড়ের ভিতর বালিকার সম্মুখে আমার দাঁড়াইয়া থাকিতেও যেন কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ হইতে ছিল। আমি জোর

করিয়া আমার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বালিকাকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে বালিলাম, "ছি কেঁদনা, কাদ্‌তে আছে কি? চল আমি তোমায় বাড়ী রেখে আস্‌ছি। এস,—ভয় কি আমি তোমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো।"

বালিকা ঘাড় নাড়িয়া নীরবে সম্মতি জানাইল। আমি ধীরে ধীরে যাইয়া বালিকার সেই কুসুম-পেলব হস্তখানি ধরিলাম;— সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত প্রাণ,—সমস্ত দেহ,—এমন কি প্রত্যেক রক্ত বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত একটা মধুর আবেশে নাচিয়া উঠিল। আমি কোন কথা কহিতে পরিলাম না ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। রাস্তায় আসিতে আসিতে দুই একটী কথা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বিষয় যেটুকু জানিতে পারিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ,—তাহাদের বাটী কলিকাতায়, বালিকা তাহার মাতা ও অন্যান্য আরও কয়েকটী আত্মীয়ের সহিত রথ দেখিতে এখানে আসিয়াছিল,—ভীড়ের ধাক্কায় সে তাহাদের নিকট হইতে বিছিন্ন হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। সে তাহার মাতাকে খুঁজিবার জন্য ভীড়ের ভিতর অন্য মনস্কভাবে এদিক ওদিক দেখিতেছিল, সেই সময় সহসা পশ্চাৎ হইতে সবলে ধাক্কা আসায় সে তাল সামলাইতে না পারিয়া রথের চাকার সম্মুখে গিয়ে পড়িয়াছিল।

বালিকার দিকে চাহিতে বা বালিকার সহিত অধিক কথা

কহিতে আমার যেন কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ হইতেছিল। রাস্তায় অসংখ্য লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে, সকলেরই দৃষ্টি এক একবার আমাদের উপর পতিত হইতেছে। কাজেই বালিকাকে আর আমি বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা বা সুযোগ দেখিলাম না। ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার দুইখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া, গাড়ীর অপেক্ষায় প্লাটফরমের এক পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন আমার প্রাণের ভিতর যে তার বাজিতেছিল, মানুষের সমস্ত জীবনের ভিতর সে তার বুঝি একবারই বাজে। আমার প্রাণের ভিতর তখন যে সুর বাজিতেছিল, সে সুর পূর্ব্বে আর জীবনে কখন শুনি নাই,—আর বোধ হয় কখন শুনিবও না। গাড়ী আসিলে আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী যথা সময়ে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতাভিমুখে ধাবিত হইল।

আমরা যে কামরাখানায় উঠিয়াছিলাম তাহাতে অন্য কোন আরোহী ছিল না। একাকী বালিকার পার্শ্বে এই কামরার ভিতর বসিয়া আমার বুকের সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। কি যেন একটা কিসের আবেশে আমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পাড়িতেছিল। এ পর্য্যন্ত আমি একবারও বালিকার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি নাই, গাড়ীতে একাকী তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানি একবার ভালো করিয়া দেখিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে

পারিলাম না। মুখ তুলিয়া একবার তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিব বলিয়া তাহার দিকে চাহিলাম। বালিকা গবাক্ষের ভিতর দিয়া মুখ বাহিরে বাড়াইয়া রেল পথের অপূর্ব্ব দৃশ্য আপন মনে বিভোর হইয়া দেখিতে ছিল। তাহার মুখের উপর একটু পূর্ব্বে যে ভাবনা চিন্তা আশঙ্কার রেখা পরিস্ফুট দেখিয়াছিলাম, এখন আর সে মুখে তাহার কোন চিহ্ন নাই। মানুষ খুব পরিচিত আপন জনের পার্শ্বে বসিয়া থাকিলে যেমন নিশ্চিন্ত থাকে বালিকার মুখের উপর সেইরূপ একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বালিকার সর্ব্বাঙ্গে কিশোরের পূর্ণ বিকাশে,—যৌবনের লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মুখের দিকে চাহিলে দৃষ্টি ফিরিতে চায় না,—সে মুখখানি কি সুন্দর,—বিধাতা যেন বড় যত্নে সে মুখখানি অতি সূক্ষ্ম তুলিকায় আঁকিয়া দিয়াছেন। কামরার ভিতর পাগ্‌লা বাতাস শোঁ শোঁ করিয়া ঢুকিয়া বালিকার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি ওলোট পালোট করিয়া মুখে চোখে আনিয়া ফেলিতেছিল,—তাহাতে যেন সে মুখের আরও শত শোভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি বিভোর হইয়া পলক শূন্য নয়নে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম,—সহসা বালিকা গবাক্ষ হইতে মুখ ফিরাইল,—তাহার চোখের সেই কালো তারা দুইটী আমার চোখের কালো তারা দুইটীর সহিত সম্মিলিত হইল। বালিকা লজ্জায় ঈষৎ হাসিয়া মুখখানি নত করিল। তাহার

প্রাণের ভিতর কি হইল বলিতে পারি না,—কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন কেমন একটা আবেগে আর সমস্ত প্রাণটা একেবারে দুমড়াইয়া পড়িল। শত প্রশ্ন বালিকাকে করিবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণটা আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল,—কিন্তু কণ্ঠ হইতে কোন প্রশ্নই বাহির হইল না। বালিকা কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে থাকিয়া আবার ঘাড় তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইল। সে হাসিটুকু যেন আমার হৃদয়ের ভিতর পাক খাইতে লাগিল,—আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

হাওড়ার ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি বালিকাকে লইয়া ট্রেণ হইতে অবতীর্ণ হইলাম। প্লাটফরমের পার্শ্বেই ভাড়াটীয়া গাড়ী সকল আরোহীর জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল,—আমি তাহারই একখানি ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। বালিকা আমাকে তাহাদের বাটীর যে ঠিকানা দিয়া ছিল,—আমি গাড়ওয়ানকে সেই ঠিকানায় লইয়া যাইতে বলিলাম। গাড়ওয়ান গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল গাড়ী এ গলি সে গলির ভিতর দিয়া আসিবার পর একটা অতি ক্ষুদ্র গলির ভিতর প্রবেশ করিল। গাড়ী সেই গলির ভিতর একখানি অতি ক্ষুদ্র দ্বিতল

বাড়ীর সম্মুখে আসিবা মাত্র বালিকা বলিয়া উঠিল, "এই আমাদের বাড়ী।"

আমি গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। গাড়ী সেই বাটীর দরজায় দাঁড়াইল। বালিকা গাড়ী হইতে অবত্তীর্ণা হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি নাম্‌বেন না? আসুন না আমাদের বাড়ীতে।"

গাড়ী আসিয়া যে পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল তাহা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম এ ভদ্র পল্লী নহে। আজ প্রায় দশ বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেছি। কলিকাতায় অনেক রকম বন্ধুর সহিতই আমার আলাপ হইয়াছে। তাহাদের কৃপায় কলিকাতার কিছু আর জানিতে আমার বাকি নাই। এই দশ বৎসরের ভিতর শত প্রলোভনের শত পরীক্ষা হইতে আমি অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি। কাজেই কোন প্রলোভনই যে আমাকে আমার কর্ত্তব্য হইতে এক পদও হঠাইতে পারিবে না, তখন এ বিশ্বাসটুকু আমার হৃদয়ে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এই জঘন্য পল্লীতে এমন সুন্দর কুসুম বিকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমার সমস্ত প্রাণটা যেন ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। লজ্জায় আমি চোক তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিলাম না। অতি কষ্টে জড়িত কণ্ঠে কেবল মাত্র বলিলাম, "না।"

বালিকার মুখখানি যেন আমার কথায় একটু ম্লান হইয়া পড়িল, সে যেন কেমন একটা করুণ স্বরে বলিল, "কেন আস্থন না।"

বালিকার কথায় কোন উত্তর দিতে আমার আর সাহস হইল না,—আমার বুকের ভিতর গুরগুর করিয়া উঠিতেছিল। আমি গাড়ওয়ানকে উচ্চঃস্বরে বলিলাম, "হাঁকাও।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিন যেমন পূর্ব্বেও যাইতে ছিল এখনও ঠিক সেই ভাবেই যাইতেছে, কর্ম্মের ভিতর দিয়া,—ধর্ম্মের ভিতর দিয়া,—আশা ও নিরাশার ভিতর দিয়া সে পূর্ব্বেও যেমন যাইতেছিল এখনও ঠিক সেই ভাবেই চলিতেছে। পৃথিবীর সুখ দুঃখ, শত পরিবর্ত্তনের দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। দিন রাত্রের কোলে, রাত্রি দিনের কোলে ক্রমাগতই ঢলিয়া পড়িতেছে। মাহেশের উল্টা রথের পর চারি দিন কালের কোলে,—অতিতের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। এই চারি দিনের ভিতর এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি সেই অপরিচিতা,—অজানিতা বালিকার মুখখানি ভুলিতে পারি নাই,—জীবনে যে আর কখন ভুলিতে পারিব সে আশাও আমার নাই। কি কুক্ষণে তাহাকে দেখিয়াছিলাম,—কি কুক্ষণে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে ছুটিয়াছিলাম যাহাতে আমার সমস্ত জীবনটা আজ একেবারে এমনি করিয়া অসার হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া শুনিয়া এ জীবনটা একেবারে বৃথা করিয়া ফেলিলাম,—পৃথিবীর কোন কাজেই লাগাইতে পারিলাম না।

চারি দিন বালিকার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু জীবন যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত

হইয়াও তাহার স্মৃতিটুকু প্রাণ হইতে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না। বালিকার সেই সরল মুখখানি আমার চক্ষুর উপর যেন ক্রমাগতই নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম ততই যেন আমার সমস্ত প্রাণটা থাকিয়া থাকিয়া শিহরীয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিয়াছিলাম এ জীবনে আর কখনও বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিব না,—যত দিন বাঁচিয়া থাকিব,—যত দিন কলিকাতায় থাকিব ততদিন কিছুতেই আর ও পল্লীর পথও মাড়াইব না। কিন্তু আমি তাহা মনে করিলে কি হইবে,—জানিনা কোন পাপে বিধাতা আমার উপর বিমুখ হইয়াছিলেন। আমার অজানিত ভাবে আমার মনের সমস্ত বল আমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পাঁচ দিনের দিন বৈকালে বাটী হইতে বাহির হইয়া নানা রাস্তা ঘুরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সশঙ্কিত হৃদয়ে আমি সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিলাম। কখন যে সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহা আমার খেয়াল ছিল না। কিন্তু সেই গলির ভিতর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই আমি বুঝিলাম এই গলির ভিতর প্রবেশ করা আমার একেবারেই উচিত হয় নাই। ফিরিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম কিন্তু ফিরিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার অজ্ঞাতসারে আমি আমার মনের বল সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তখন যদিও তাহা আমি বুঝি নাই,—মানুষ আমার বিশ্বাস তাহা বুঝিতে

পারে না কিন্তু এখন আমি বেশ বুঝিতেছি যে মনের উপর তখন আমার কোনই অধিকার ছিল না। কুমতি তখন আমার কর্ণে যুক্তি দিতেছিল, "ও রাস্তা দিয়া চলিতে অপরাধ কি? সরকারী রাস্তা,—এ রাস্তাতো আর কলঙ্কিত নহে। রাস্তা দিয়া চলিলেই যদি হৃদয় কলুষিত হয় তবে আমি পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলাম কেন? এত লেখা পড়াই বা শিখিয়াছিলাম কি করিতে? এ মনের বলটুকু যদি আমার না থাকে তবে আমার মরণই মঙ্গল।"

কুমতিরই জয় হইল, চিরকালই তাহাই হইয়া আসিতেছে। আমি ফিরিতে পারিলাম না ধীরে ধীরে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি সেই দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিবামাত্র দেখিলাম, বালিকা সেই বাটীর দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া একটী বৃদ্ধার সহিত কি কথোপকথন করিতেছে। আমি তাহার দিকে না চাহিয়া সেই বাটীর সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার অবাধ্য নয়ন আমার কোন আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই বঙ্কিম ভাবে একবার সেই বালিকার মুখখানি চুরি করিয়া দেখিবার আশায় পলকের জন্য সেইদিকে চাহিল। বালিকাও আমার দিকে চাহিয়াছিল, আমার দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির সহিত সম্মিলিত হইবামাত্র সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিল। সে হাসিটুকু আমার মনে হইল এখানকার নয়,—সে যেন স্বর্গের। সেই হাসিটুকুতে আমার প্রাণের সমস্ত ফুল যেন এক সঙ্গে একেবারে বিকাশিত

হইয়া উঠিল। বিদ্রোহী অশ্বের মত আমার পদদ্বয় যেন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা আর আমার এই দেহটাকে এক ইঞ্চিও অগ্রে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল না। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমাকে দাঁড়াইতে হইল। বুকের ভিতরটা এমনি দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল যেন দম বন্ধ হইবার মত হইল। আমি অবনত মস্তকে বালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে লাগিলাম।

বালিকা আমাকে দেখিবামাত্র হাসিতে হাসিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে আমার নিকটে আসিয়া আমার দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া মধুর স্বরে বলিল, "আজকে আর আপনাকে ছাড়্‌ছিনি,—আজ আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে।"

বালিকার সেই মধুর স্পর্শ তখন আমার দেহ প্রতি শিরায় অনুভব করিতেছিল। আমি সহসা বালিকার কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। অতি কষ্টে একবার মাত্র ঘাড় তুলিয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মুখখানা যেন কেমন লাল হইয়া উঠিল;—বালিকা আমার হস্তে ঈষৎ টান দিয়া আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "না আজ আর আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়্‌ছিনি,—আজ আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে। নিন—চলুন।"

বালিকা আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। আমি একটা

চোরা দৃষ্টিতে আসে পার্শ্বে চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিলাম। কেহ কোথায় আছে কিনা। এই সদর রাস্তার উপর বালিকার এরূপ আচরণ আমার নিকট যেন কেমন লজ্জাস্কর বলিয়া মনে হইতেছিল। লজ্জারাণী চারিপার্শ্ব হইতে আসিয়া আমার দেহটাকে এমনি বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিলেন যে আমার ঘাড় তুলিয়া চাহিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল। আমি জড়িতকণ্ঠে মহাকষ্টে কোনক্রমে বালিকার কথার উত্তর দিলাম, "না—না,—আজ থাক্ আজ আমার আবার একটু বিশেষ কাজ আছে। আজ না—আজ না—"

আমার কথায় বালিকার মুখখানি যেন বেশ একটু মলিন হইয়া পড়িল,—সে মৃদুস্বরে বলিল, "একবার দু' মিনিটের জন্য যাবেন. তাতে আর এমন কি ক্ষতি হবে। না—না—আজ আমি আপনাকে ছাড়বো না।"

বালিকার মুখখানি মলিন হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের সমস্ত ভিতরটা একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর না শব্দ আমার কণ্ঠ হইতে কিছুতেই বাহির হইতে চাহিতে ছিল না। তথাপি আমি প্রাণপণ শক্তিতে হৃদয়ের সবটুকু শক্তি কেন্দ্রিভূত করিয়া বলিলাম, "না—না—আজ আমায় ছেড়ে দাও, আর এক দিন নিশ্চয়ই আসবো।"

বালিকার সেই বড় বড় চক্ষু দুইটীর পল্লবদ্বয় এইবার ছল্‌ছল্‌

করিয়া উঠিল,—সে মহা করুণ স্বরে বলিল, "আপনি সেদিন আমাদের বাড়ীতে না ঢুকে চলে গেস্‌লেন ব'লে মা আমায় কত বক্‌লেন। আজও যদি আপনি আমাদের বাড়ী না যান তা'হ'লে আজও আমায় বকুনি খেতে হবে। মা একবার চলুন,—শুধু একবার মার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবেন।"

আমার আপত্তি করিবার ক্ষমতা পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছিল,—যেটুকু মনের বলে আপত্তি করিতেছিলাম, বালিকার সেই ছল্‌ছল্‌ নয়নের সম্মুখে সে সমস্তই ভাসিয়া গেল, আমি অতি ক্ষীণকণ্ঠে অতি ধীরে ধীরে কেবলমাত্র বলিলাম, "চল—"

আমার কথায় বালিকার সমস্ত মুখখানি আনন্দের জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইল, আমি লজ্জিত স্পন্দিত হৃদয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আজ দশ বৎসর কলিকাতায় বাস করিতেছি,—এই দশ বৎসরের ভিতর যেস্থানে কোন দিন প্রবেশ করি নাই। মানুষ কেন এস্থানে আসিয়া কি সুখের আশায় নিজের অমন পবিত্র চরিত্রটা কলুষিত করিয়া বসে তাহাই ভাবিয়া মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কত দিন মনে মনে হাসিয়াছি,—আজ ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমায় নিজেকেই সেইস্থানে প্রবেশ করিতে হইল। যে জিনিষকে চির দিন মনে মনে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—আজ তাহাদেরই সহিত মেশামিশি হইতে চলিল। প্রলোভন মানুষকে কখন কোন ভাবে

আক্রমণ করে মানুষের সাধ্য কি যে তাহা বুঝিতে পারে। আজ আমি বেশ বুঝিয়াছি কোন মানুষই এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারে না যে আমি কখনও প্রলোভনে পড়িব না। তাই সাধু মহা পুরুষরা প্রলোভনের নিকট হইতে দূরে থাকিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিয়াছেন ;—কারণ তাঁহারা জানিতেন,—বুঝিতেন যে প্রলোভনের নিকট থাকিয়া প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যের বাহিরে। আগুন লইয়া খেলা করিলে যেমন বিপদ পদে পদে হইবার সম্ভাবনা সেইরূপ প্রলোভনের নিকটে থাকিলে প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নীচেটা অতি অন্ধকার। উপরে উঠিবার সিঁড়ির এক পার্শ্বে একটী কেরোসিন ল্যাম্প-জ্বলিতেছে, তাহারই আলোয় কতকটা অন্ধকার পাতলা হইয়া পড়িয়াছে। উঠানের চারিদিকেই আবর্জ্জনা, তাহা হইতে একটা বিকট গন্ধ বাহির হইতেছে। বালিকা তরতর করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল,—কিন্তু আমি সেরূপ তরতর করিয়া উপরে উঠিতে পারিলাম না। সিঁড়িগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—অর্দ্ধ অন্ধকারে তাহা আবার ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা হইয়া আছে, কাজেই আমাকে অতি সন্দর্পনে ধীরে ধীরে সেই সিঁড়ি দিয়া তিন চারিবার হোঁচট খাইয়া উপরে উঠিতে হইল। নীচেটা যেরূপ অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় উপরটা সেরূপ নহে। উপরে তিনটী ঘর,

তিনটী ঘর হইতেই উজ্জ্বল আলোক বারান্দায় আসিয়া পড়িয়া বারান্দার সমস্ত অন্ধকারটা একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। বালিকা উপরে উঠিয়া বারান্দার উপর রেলিং ধরিয়া আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল,—আমি উপরে উঠিবমাত্র সে মৃদু হাসিয়া আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "আসুন।"

বালিকা বারান্দা দিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সম্মুখে একটা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। আমিও ধীরে ধীরে যাইয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘরটা ঠিক রাস্তার উপরেই। ঘরখানার আগাগোড়া একেবারে সুসজ্জিত,—চারিদিক চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মেজের উপর মোটা গদি পাতা। তাহার উপর ফরাস করা, ফরাশের চারিপার্শ্বে অনেকগুলি মোটা মোটা তাকিয়া। গৃহের প্রাচীর গাত্রে চারিদিকে চারিখানা বড় বড় আয়না,—তাহারই আসে পার্শ্বে অনেকগুলি বিদেশীয় নগ্ন সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি। গৃহের মধ্যস্থলে একটা চারিডাল নানাবর্ণের বেলওয়ারী ঝাড় ঝুলিতেছে। একপার্শ্বে একটা বুককেস্,—সম্মুখের একটা ব্রাকেটের উপর একটা বড় ঘড়ী টিক্ টিক্ করিতেছে। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি আটটা বাজে। আমি গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, "বসুন"।

আমার তখন আর আমারত্ব কিছুই ছিল না। আমি কলের পুতুলের মতন সেই ফরাশের উপর যাইয়া উপবিষ্ট হইলাম। বালিকা

আমার সম্মুখে সেই বুককেসটা ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, আমি ফরাশে উপবিষ্ট হইলে সে আমাকে আবার কি একটা প্রশ্ন্ করিতে যাইতেছিল সেই সময় উপরের ছাদ হইতে কে একজন কর্কশ কণ্ঠে উচ্চস্বরে ডাকিল, "ও নেড়া, ও নেড়ি• কোন চুলোয় গেলি। ওস্তাদ্জী এসে যে দাঁড়িয়ে রইলো,—ও নেড়ী।"

সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা তাহার মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করিল,—সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি একটু বসুন,—আমি মাকে ডেকে আনি। আমি যাব আর আসবো।"

আমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই বালিকা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি একাকী সেই গৃহের ভিতর বসিয়া বসিয়া সেই বালিকার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। এমন সরল সুন্দর বালিকা কি কদর্য্য স্থানেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে! ভগবানের একি বিচিত্র লীলা! এ লীলা মানুষের বোঝা অসাধ্য। পূর্ব্ব জন্মে বালিকা নিশ্চয়ই এমন কোন পাপ করিয়াছে যাহার ফলে বালিকার এই কদর্য্য স্থানে জন্ম। অতি অল্পক্ষণ পরেই বালিকা তাহার মাতার সহিত আবার আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। আমি বিস্মৃত ভাবে সেই নবাগতা রমণীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। রমণী প্রায় বিগত-যৌবনা। সময়ে বোধ হয় কন্যার মতই সুন্দরী ছিল,—কিন্তু পাপের জ্বলন্ত অনলে

পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্যই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যৌবনও সময় বুঝিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু রমণী প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য সকল ফাঁদই পাতিতে বাকি রাখে নাই। পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী, মস্তকে অবগুণ্ঠন একেবারে নাই। যে সকল ভূষণে ভূষিত থাকিয়া নারী দেবী নামে পরিচিত হয়, তাহার কিছুই এই রমণীর দেহের কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। রমণী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি ভালো হয়ে উঠে বসুন না। অমন ক'রে বস্‌তে যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

লজ্জায় আমায় আরও জড়সড় করিয়া ফেলিল,—সেই রমণীর মুখের দিকে চাহিতে আমার যেন কেমন ভয় হইতে ছিল। আমি অবনত মস্তকে কোন ক্রমে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে না,—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমি বেশ আছি।"

রমণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাতে দোষ নেই,—আমাদের বিছানা ভাল বিছানা। আপনি কি তামাক খান?"

লজ্জায় আমার কণ্ঠতালু একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, আমি প্রাণপণ বলে অতি কষ্টে বলিলাম, "না।"

রমণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা জানি বাবা,—আজ কালকার

ছেলেরা আর বড় একটা তামাক খায় না। ওই জন্যে আমাদের বাড়ী থেকেও ওসব পাঠ উঠে গেল। আমাদের বয়সে আমরা দেখেছি,—এক একজনের গুড়গুড়ির বাহার কি! নলটাই চার পাঁচ হাত। তা বেশ বাবা, তামাক টামাক ও ছাই যত না খাওয়া যায় ততই ভাল।"

আমি অবাক হইয়া রমণীর এই কথাগুলি শুনিতেছিলাম। পূর্ব্বে এইরূপ রমণীদিগের সহিত এরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত কখন হই নাই। বাহির হইতে লোকের মুখে ইহাদের সম্বন্ধে যেটুকু জানিয়াছিলাম, তাহাতে আমার মনে মনে এইটুকু সিদ্ধান্ত ছিল যে, ইহারা ভদ্রতা কাহাকে বলে তাহা একেবারেই অবগত নহে। ইহাদের আচার ব্যবহার,—কথাবার্ত্তা অতি কদর্য্য,—কিন্তু এই রমণীর কথা শুনিয়া আমার সে বিশ্বাস উল্টাইয়া গেল। ইহাদের সহিত আলাপ না করিয়া, কেবল বাহির হইতে লোকের কথা শুনিয়া ইহাদের নিন্দা করিয়া আসিয়াছি, সেজন্য মনে মনে নিজেই যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। এই নিরাশ্রয়া, নিরীহ রমণীকুলের প্রতি আমার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া কেমন যেন একটু করুণার ছায়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল পৃথিবীতে ভাল মন্দ সকল বস্তুতেই আছে। ইহাদের ভিতরেই বা থাকিবে না কেন? কিন্তু তখন তো একবারও বুঝিতে পারি নাই যে প্রলোভন আমাকে এমনি করিয়া বেষ্টন করিবার

চেষ্টা করিতেছে। ইহারা ভাল হইতে পারে না,—ইহাদের ভাল হওয়া উচিত নয়,—ঈশ্বরেরও তাহা অভিপ্রেত নহে। মানুষের মনুষত্বের বিচারের জন্য পরমেশ্বর প্রবঞ্চনা, প্রতারণা উপাদানে পৃথিবীতে বারনারী সৃষ্টি করিয়াছেন। আগুনের ধর্ম্মই যেমন দগ্ধ করা বারনারীর ধর্ম্মও সেইরূপ প্রতারণা প্রবঞ্চনা করা। তাহারা যদি তাহা না করিয়া অন্য পথ গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহারা ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে চিরকাল দুঃখে দারিদ্রে জ্বলিয়া পুড়িয়া নিজ কর্ম্ম-ফলের শেষ করিয়া থকে। ভগবানের রাজ্য বিশাল,—সন্তান অসংখ্য। তিনি তাহাদের এক একজনকে এক একটী কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার আদেশ বুঝিতে পারিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য করে তাহারাই জগতে সুখী হইতে পারে, আর যাহারা বুঝিতে পারে না তাহাদের দুঃখেরও অবধি থাকে না। রমণী এইবার তাহার কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিল, "যানা বাবুর কাছে বসে' একটু হাওয়া করগে—যানা।"

বালিকা অবনত মস্তকে তাহার মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল,—জননীর আদেশ পাইয়া সে ধীরে ধীরে আসিয়া আমার পশ্চাতে বসিয়া আমাকে বাতাস দিবার জন্য একখানি নানা কারুকার্য্য খচিত পাকা ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। রমণী একটু নীরব থাকিয়া আবার আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তবে এখন আমি আসি বাবা,—আমার আবার শতেক কাজ; একটু কি সুস্থ

হ'য়ে বস্‌বার যো আছে। তোমরা ততক্ষণ দু'জনে বসে একটু গল্পসল্প কর। মাঝে মাঝে সুবিধে মত এস। বাবা তুমি আমার মেয়ের জীবনদান করেছ,—সে কথা কি বাবা জীবনে ভুলবো। ও তোমারই।"

রমণী আর কোন কথা না বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল কিন্তু দরজার নিকট যাইয়া ফিরিয়া বলিল, "ওরে নেড়ী বাবুকে পানটান এনে দে। যত্ন খাত্তির কর্ত্তে যেন ভুলিসনি। বাবু গেলে ঘরে চাবি দিস্। আমি এখন একবার গিরির মার কাছে যাচ্ছি, গিরির বাবু নাকি কাল রাগারাগি ক'রে চলে গেছে। গিরির মা একবার অনেক ক'রে যেতে বলেছে, না গেলে আবার দশো কথা শোনাবে।"

রমণী কথা কয়টী বলিতে বলিতেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বালিকা ধীরে ধীরে অতি সলজ্জভাবে আসিয়া আমার পার্শ্বটীতে বসিল,—বালিকার বাহু আমার বাহু স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত দেহ একেবারে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি বালিকাকে দুই একটি প্রশ্ন করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু লজ্জা যেন একেবারে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল,—আমার কণ্ঠ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। বালিকা আমার পাশটীতে বসিয়া অবনত মস্তকে মাঝে মাঝে বঙ্কিম দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেছিল, কিন্তু আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে

পারিতেছিলাম না। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল, কাহার মুখে কথা নাই। শেষ আমি বহু চেষ্টায় আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রিভূত করিয়া অতি মৃদুস্বরে কোনক্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামতো আমায় বলোনি। সেদিন জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ভুলে গেছ্‌লুম। শুনি তোমার নামটা কি?"

বালিকা আমার প্রশ্নে ফিক্ করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া ফেলিল; মৃদুস্বরে বলিল, "ওইতো আমার নাম শুন্‌লেন! মা যা বলে ডাকলে।"

আমি বালিকার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "ওতো ডাক নাম, পোষাকি নামতো কিছু আছে?"

বালিকা মধুর কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমার নাম লীলাবতী।"

ঘড়ীতে টুন্ টুন্ করিয়া নয়টা বাজিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে আর এখানে বসিয়া থাকা উচিত নয়। ঘড়ীতে নয়টা বাজিবামাত্র আমি লীলাকে বলিলাম, "রাত্রি ন'টা বাজলো, আজ আমি তা হ'লে এখন যাই, আবার একদিন আসবো।"

লীলা আমার ডান হস্তের আঙ্গুলগুলা নাড়িতেছিল, আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, আর একটু থাকুন না, রাততো এই সবে ন'টা।"

আমি ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলাম, "না আমার আবার একটু কাজ আছে।".

লীলা মুখখানি ম্লান করিয়া বলিল, "তাহ'লে আবার কবে আস্‌বেন। শিগ্‌গির একদিন আসবেন তো?"

আমার উঠিতে ইচ্ছাই করিতে ছিল না,—কিন্তু এস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা দোষের এইটুকু মনে হওয়ায় আমি একরূপ জোর করিয়াই উঠিয়া পড়িলাম, বালিকার কথার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "হাঁ আস্‌ব বই কি,—দু' একদিনের মধ্যেই আবার এসে দেখা করবো।"

লীলা কোন কথা কহিল না, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিল। সে সদর দরজার নিকট আসিয়া আমার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "আসবেন যেন ভুলবেন না।"

আমি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, প্রলোভন তাহা অপেক্ষা শত গুণ অধিক তেজে মানুষকে পাপের দিকে টানিতে থাকে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি যে প্রলোভনের ভিতর যাইয়া পড়িলাম সেই প্রলোভন সতেজে আমাকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলিলাম,—লক্ষ্যও হারাইলাম,—সেই চক্রে পড়িয়া এমন কি আমার বিবেচনা শক্তিও লুপ্ত হইয়া গেল। আমি যে অন্যায় করিতেছি, এরূপ করা আমার কোন হিসাবেই উচিত নয়—তাহা যে বুঝিতেছিলাম না তাহা নহে কিন্তু বুঝিলে কি হইবে আমি মোহে অন্ধ হইয়াছিলাম,—বুঝিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য করিবার আর আমার ক্ষমতা ছিল না। বিবেকের তাড়না যে আমি সহ্য করিতেছিলাম না তাহাও নহে,—যে দিন মনে পড়িত জননী আমাকে লেখা পড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন,—তাঁহার আর নিজের বলিবার কেহ নাই তখন আমার সমস্ত প্রাণটা কে যেন সজোরে মুষড়াইয়া ধরিয়া ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিত কিন্তু তাহা অতি ক্ষণিকের জন্য পরক্ষণেই আবার সমস্ত প্রাণটা মোহতে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাই ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিত। আশা ও নিরাশার ভিতর দিয়া এই ভাবে দিনগুলি আমার কাটিতেছিল বেশ।

কাজ কর্ম্ম লেখা পড়ায় কিছুতেই মন বসিতে চাহিত না,—সদাই যেন কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। সে ভাবটা ঠিক যে কিরূপ তাহা মুখে ব্যক্ত হয় না,—যাহারা না এ অবস্থায় পড়িয়াছে তাহারা সে ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিবে না।

দিনমানটা একরূপ যাহ'ক ভাবে কাটিত কিন্তু সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন সমস্ত প্রাণটা চন্‌মন্ করিতে থাকিত। লীলার নিকট যাইব না শতবার শত ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়াও কোনটাই রক্ষা করিতে পারিতাম না। সন্ধ্যা হইবা-মাত্রই আমি সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে অতি পরিপাটি রূপে সজ্জিত করিয়া লীলাদের বাটীর দিকে ছুটিতাম। পূর্ব্বে বেশ ভূষার উপর আমার কোন দিনই লক্ষ্য ছিল না কিন্তু লীলাদের বাটী যাইবার পর হইতেই বেশ ভূষার উপর দৃষ্টিটা আমার কিছু তীব্র ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সর্ব্বদা বেশ একটু সৌখিনভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণটা যেন সর্ব্বদাই বিশেষভাবে লোলুপ হইয়া থাকিত। কেন যে এমন হইয়াছিল তাহার আজও সঠিক মীমাংসা করিতে পারি নাই তবে আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয় মোহ রাজ্যে বেশের চাক্‌চিক্যটারই আদর অধিক। তাই মানুষ যখন প্রলোভনের আকর্ষণে পড়িয়া মোহরাজ্যে প্রবেশ করে তখন আপনা হইতেই দেহটার পারি-পাট্যের জন্য তাহাদের বেশ ভূষার উপর দৃষ্টিটা একটু তীব্র

হইয়া উঠে। যাক সে কথা, মোটের উপর কথা হইতেছে এই আমি প্রত্যহই সন্ধ্যার পরই লীলাদের বাটী ছুটিতাম। যাইবার সময় প্রত্যহই একটা না একটা জিনিষ তাহার জন্য কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আমার প্রদত্ত পমেটম, সাবান, সেণ্ট জামা প্রভৃতিতে তাহার আলমারী, সেল্‌ফ, কাটের থাক ক্রমেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। আমার প্রদত্ত জিনিষে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সত্যই আমার প্রাণটা একটা বিমল আনন্দে নাচিয়া উঠিত। পিতার অর্থে এই সকল জিনিষ পত্র যে অপাত্রে অর্পিত হইতেছে তাহা একদিনের জন্য মনের কোনেও স্থান পাইত না। যাহাকে দিয়া আনন্দ হয় তাহাকে দিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

লীলাও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আপনাকে বেশ সুন্দর ভাবে সজ্জিত করিয়া আমার অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত; আমি যাইয়া উপস্থিত হইলে তাহার মুখের হাসি আর ধরিত না। একটা আনন্দের তীব্র জ্যোতিঃ তাহার মুক চোখের উপর ফুটিয়া উঠিত। দুই জনে মুখোমুখী করিয়া বসিয়া আমাদের কত কথাই হইত, প্রত্যহই মান অভিমান আদর সোহাগে রাত্রি বারটা বাজিয়া যাইত। মহা অনিচ্ছা-সত্বে আকাশ কুসুম গড়িতে গড়িতে আমি বাড়ী ফিরিতাম। এই প্রথম যৌবনে প্রণয় স্রোতের ভিতর দিয়া মহা সুখে আমার ছয়মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

এই ছয় মাসের ভিতর এমন একটু অবসর পাইলাম না যে বাটী যাই। মা বাটী আসিবার জন্য উপর্য্যুপরি পত্র লিখিতেছিলেন, কিন্তু সে পত্রের তখন আমার নিকট কোনই মূল্য ছিল না। আমি কেমন করিয়া বাড়ী যাইব? সে সময় এক দিনের জন্যেও যদি লীলাকে আমি একবার না দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমি আত্মহত্যা করিতাম। প্রথম প্রথম লীলাদিগের অনেক কার্য্য আমার নিকট যেন কেমন কদর্য্য বলিয়া মনে হইত। কিন্তু সময়ে আমার সে ভাব কাটিয়া গিয়াছিল। দেখিয়া দেখিয়া সে সব ব্যাপার আমার বোধ হয় সহ্য হইয়া গিয়াছিল, চোখে আর কিছুই বিসদৃশ্য ঠেকিত না। এত দিন বোধ হয় আমি তাহাদের ভিতরের কোন ব্যাপারই দেখিতে পাই নাই উপর উপরই দেখিতেছিলাম, এইবার আমার ভিতরের ব্যাপার দেখিবার সুযোগ ঘটিল। এক দিন গভীর রাত্রে আমি বাড়ী ফিরিব বলিয়া উঠিতেছিলাম, লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা তুমি দুপুর বেলা কি কর? এখন তো তোমাদের কলেজ বন্ধ,—এখন তো এখানে দুপুর বেলা রোজ আস্‌তে পার।"

আজ কয়েকদিন পূর্ব্বে আমিই লীলাকে বলিয়াছিলাম, আমাদের কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—মা আমাকে বাড়ী আসিবার জন্য ক্রমাগত চিঠি লিখিতেছন,—কিন্তু আমি তোমায় ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে পারিতেছি না। লীলা সে কথার কোন উত্তর দেয়

নাই, কেবল একবার ঠোঁট উল্‌টাইয়াছিল মাত্র। আজ লীলার এই কথায় সেদিনকার কথাটা আবার আমার মনে পড়িল। কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—বাড়ীতে দুপুরে একাকী বসিয়া থাকিতে মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু এত দিন লীলা দুপুরে আসা সম্বন্ধে কোন কথা না বলায় প্রাণে হাজার ইচ্ছা সত্বেও আমি তাহাদের বাটী আসিতে পারি নাই। আজ লীলা দুপুরে আমায় নিমন্ত্রণ করায় আমার সমস্ত প্রাণটা অনেন্দে যেন একবার দুলিয়া উঠিল, আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম, "দুপুরে বাড়ীতে চুপ ক'রে বসে থাকি, একলা ব'সে থাক্‌তেও ভাল লাগে না। আচ্ছা কা'ল থেকে আমি দুপুর বেলা আসবো।"

তাহার পর দিন হইতে আমি নিয়মিত প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আহারের পর লীলাদের বাড়ীতে যাইতে আরম্ভ করিলাম। আগে সন্ধ্যার পর লীলাদের বাড়ী যাইয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর বাটী ফিরিতাম,—এখনও সেইরূপই ফিরিতেছিলাম,—মধ্য হইতে সময়টা কিছু বাড়িয়া গেল। এক্ষণে সেই যে মধ্যাহ্নে আহারের পর লীলাদের বাটী যাইতাম আর সেই রাত্রি একেবারে দ্বিপ্রহরে ফিরিতাম। দুই একটা টাকা প্রত্যহই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম,—বৈকালে জলযোগের জন্য প্রত্যহই একটী করিয়া টাকা লীলার মাতার নিকট দিতাম,—বৈকালের জলযোগটা সেইখানেই শেষ হইত। এই কয়মাসের ভিতরে আমার জীবনের অনেক উন্নতি হইয়াছিল,—

আমি লীলার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিলাম। প্রথম এই মা বলিয়া ডাকিতে আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত,—জিহ্বা জড়াইয়া আসিত কিন্তু এক্ষণে আর কোন প্রকার দ্বিধা ছিল না বরং তাহাদের সহিত সম্বন্ধটা যাহাতে শীঘ্রই বেশ একটু ঘণিভূত হইয়া উঠে সেই জন্য আমি কাজে ও অকাজে নানা অছিলায় তাহাকে প্রায়ই মা মা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়া ছিলাম। এখন আমার মনে হয়, যে আমি কেমন করিয়া অমন ভাবে তাহাকে মা মা বলিয়া ডাকিতাম! আমারতো কিছুমাত্রই বাধিত না,—তাহার জন্য তখন তো একটুও লজ্জাও হইত না! এই কথাগুলা যখন আমি ভাবি তখন আমি নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি। তবে এখন এইটুকু বুঝিয়াছি মোহ চক্রে পড়িলে মানুষের লজ্জা সরম ভয় কিছুই মনে স্থান পায় না। সদ্‌বুদ্ধি,—আত্মমর্য্যাদা কেমন যেন আপনা হইতেই সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে,—তাহাদের আর কার্য্যকরি ক্ষমতা একেবারেই থাকে না। বাত রুগীর মত তাহাদের ভিতরের ক্ষমতাটা একেবারে লুপ্ত না হইলেও উপরটা একেবারে অসাড় হইয়া থাকে। ভিতরে ভিতরে সমস্তই অনুভব করা যায়,—কিন্তু কেমন যেন কিসের মোহে সমস্তই জড়াইয়া থাকে। আমি মন্দ করিতেছি,—ইহা আমার করা উচিত নহে এটুকু যে আমি বুঝিতে ছিলাম না তাহা নহে,—কিন্তু বুঝিলে কি হইবে আমাতে তো আর আমি

ছিলাম না। আমার ভিতরে মনুষ্যত্ব যাহা ছিল তাহা এই ছয় মাস ধুইয়া ধুইয়া একেবারে নিঃশেষ হইবার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এক দিন অপরাহ্নে লীলাদের বাটী যাইয়া দেখিলাম,—বাটীটা যেন বেশ একটু সোরগোল হইয়া রহিয়াছে। আমি আজ কাল প্রত্যহই মধ্যাহ্নে লীলাদের বাটী যাইতেছিলাম,—মধ্যাহ্নে শুধু তাহাদের বাটী কেন আশে পার্শ্বে পাড়ার কোন বাড়ীতেই বিশেষ কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনাইয়া উঠিত সমস্ত পাড়াটাও ততই যেন প্যাঁচার মত জাগিয়া উঠিত। পথে বেলফুল, কল্পিবরফ, ঘুঘ্‌নিদানা, ফেরিওয়ালার মুখে মুখে নানা সুরে ধ্বনি হইত, ভিতরেও বেশ ভূষার ঘস্‌ঘসানির সহিত গান বাজনা হাসি তামাসার হিল্লোল উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে সুরার বোতলের পর বোতল ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে কত বড় বড় বাবুর পূর্ণ ট্যাক্ শূন্য হইয়া পড়িত। সমস্ত রাত্রি পাড়াটার ভিতর যেন একটা পৈশাচিক নৃত্য চলিত। কিন্তু ভোরের হাওয়া বহিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ধীরে ধীরে সমস্তই নিঝুমের ভিতর ঘুমাইয়া পড়িত। আমার সময় সময় মনে হইত সমস্ত পাড়াটা যেন একটা মায়াপুরী। দিবসে সূর্য্যের প্রদীপ্ত আলোয় সাড়া নাই,—শব্দ নাই,—বেশ নাই,—ভূষা নাই,—বাবু নাই,—মোসাহেব নাই, কিন্তু যেমনই মার্কণ্ড তাঁহার রশ্মিজাল গুটাইয়া লইলেন, অমনি একেবারে যেন একটা যাদু মন্ত্রে সমস্ত ভরাট হইয়া উঠিল।

মাতামাতি,—হাতাহাতি,—হৈ হৈ রৈ রৈ চারিদিকে পড়িয়া গেল। এই একেই ভাবে রাত্রের পর দিন দিনের পর রাত্রি সেই পাড়াটার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। যাক সে কথা আমি সে দিন সহসা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া এই অসময়ে বাড়ীখানার এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া মনে মনে বেশ একটু বিস্মিত হইলাম। আমি লীলাদের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া নীচে উঠানের মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আজ আবার বহু দিন পরে আমার পাটা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। উপরে উঠিব না ফিরিয়া যাইব তাহা কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পরিতেছিলাম না। উপর হইতে নানা অপরিচিত স্বর আসিতেছিল তাহা হইতেই বুঝিয়াছিলাম উপরে বেশ একটা ধুমধাম ব্যাপার চলিতেছে। এ অবস্থায় কি আমার উপরে উঠা উচিত? কিছুতেই নহে। কিন্তু এত দূর আসিয়া লীলার সহিত একবার না দেখা করিয়া বাটী ফিরিতেও কিছুতেই আমার মন সরিতে ছিল না। সেই সময় এক ব্যক্তি উপরের বারান্দা দিয়া কি কাজে যাইতেছিল, আমাকে এরূপ ভাবে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে ব্যক্তি উপর হইতেই আমার উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চান মশায়?"

কাহাকে চাই এ কথা আমার মুখ হইতে কিছুতেই বাহির

হইল না। কেমন যেন একটা লজ্জা আসিয়া আমাকে একেবারে হতভম্ব করিয়া দিল। আমি বার দুই তাহার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া চক্ষু অবনত করিলাম। সেই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সম্মুখের ঘরের দিকে চালিয়া বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে পুটুরাম,—নীচের উঠানের মাঝখানে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েচে,—জিজ্ঞাসা কল্লুম কাকে চান কোন উত্তর দেয় না।"

সেই ব্যক্তির কথা কয়টা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ব্যক্তি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে দেখিবার জন্য রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। এই লোকটাকে যে দিন হইতে আমি এই বাটীতে আসিতেছি সেইদিন হইতেই প্রায়ই দেখিতাম। লীলার নিকট ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই, —জানিবারও এমন বিশেষ কোন চেষ্টাও করি নাই। লীলা তাহাকে জামাই বলিয়া ডাকিত তাহা হইতেই আন্দাজ করিয়াছিলাম, এই লোকটা লীলার বোধ হয় কোন দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নির স্বামী। লোকটার চেহারাটা ছিল দেখিবার মত, এই লোকটার সমস্ত দেহটার ভিতর এমন একটা স্থান ছিল না,—যে টুকুকে ভালো বলিতে পারা যায়। তাহার রংটা ছিল তীব্র শ্যামবর্ণ, দেহটা বাঁশের মত লিক্‌লিকে—প্রস্তের দিকে একেবারে না থাকায় সেই লম্বা দেহটা সম্মুখের দিকে একটু ঝুকিয়া পড়িয়াছে। দেহটা যাহাই হউক

মাথার চুলগুলির বাহার কিন্তু যথেষ্ট। পশ্চাৎ ভাগের চুলগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছাঁটা,—সম্মুখে যথেষ্ট বড় বড়। দশ আনা ছয় আনা নহে,—ষোল আনা তিন আনা। সেই সম্মুখ ভাগের বড় বড় চুলগুলি পাতা হইয়া ঘুরিয়া ভুরুর নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। বয়স অনুমানে যতটুকু বোঝা যায় তাহাতে বাইশ তেইশ বলিয়াই বোধ হয়। এ হেন পুটুরাম রেলিংএর নিকটে আসিয়া আমাকে দেখিয়া তাহার সেই লম্বা মুখখানায় একরাশ হাসি আনিয়া বলিল, "আরে কেও জামাই যে? নীচে দাঁড়িয়ে কেন ওপরে উঠে এস,—ওপরে উঠে এস।"

তাহার বন্ধু তাহার পার্শ্বে তখনও দাড়াইয়াছিল, সে তাহার চোখ দুইটা বেশ একটু বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জামাই সে কি হে,—"

পুটুরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আরে তুমি—আমাদের জামাইকে দেখনি,—এটা যে নেড়ীর বাবু—

সে লোকটা পুটুরামের সমস্ত কথাটা শুনিবারও অপেক্ষা রাখিল না, আমার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে আসুন মশাই আসুন আপনি তাহলেতো আমাদের আপনার লোক,—আমাদের কাছে আবার লজ্জা কি?"

আমি তাহাদের কথায় আর কোন উত্তর দিলাম না,—ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিলাম। উপরে উঠিয়া দেখিলাম

বারান্দার এক ধারে একটা লোহার উনানে মাংসের হাঁড়া চড়িয়াছে। তাহারই এক পাশ্বে একরাশ পিঁয়াজের খোলা জড় করা রহিয়াছে। বারান্দার অপর প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র আয়নার সম্মুখে বসিয়া লীলা চুল বাঁধিতেছে। আমি উপরে আসিবা মাত্র বারান্দায় আরও দুই তিনটী পুরুষ দাড়াইয়াছিল,—তাহারা সকলেই একেবারে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে নেড়া তোর বাবু এসেছে,—আদর করে ঘরে নিয়ে যা। এস জামাই—এস—"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমি উপরে উঠিয়া বারান্দার এক পার্শ্বে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। পুটুরাম আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "যাও এদিক দিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে বস গে যাও।"

আমি এদিক ওদিক একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম,—আমার দৃষ্টির সহিত লীলার দৃষ্টি চকিতে বিনিময় হইল,—সে ফিক্ করিয়া একটু মৃদু হাসিল। আমি আর কোন দিকে না চাহিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া গিয়া একেবারে গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সেই রাজহংসের পালকের মত শুভ্র ফরাশের উপর উপবিষ্ট হইলাম। আমি ফরাশের এক পার্শ্বে যে স্থানটায় বসিয়াছিলাম তথা হইতে লীলাকে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও,—তাহার দেহের কতক কতক স্থান দেখা যাইতেছিল,—আমি একাকী গৃহের ভিতর বসিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া চোরের মত লুক্কাইতভাবে লীলার চুল বাঁধা দেখিতে লাগিলাম। লীলাদের বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত পুটুরামকেই কেবল মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতাম। আজ যাহাদের এইমাত্র বারান্দায় দেখিয়া আসিয়াছি তাহারা আমার সম্পূর্ণই অপরিচিত। তবে তাহাদের কথাবার্ত্তা যেটুকু শুনিয়াছি তাহাতে তাহারা যে পুটুরামের বন্ধু

সে বিষয় আমার আর বিশেষ কোনই সন্দেহ ছিল না। পুটুরাম যে লীলাদের বিশেষ আপনার লোক তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। ইহারা যে এখানে পুটুরামের সহিত আসিয়াছে তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ যে কেন মাংসের হাঁড়া চড়িল সেই টুকুই শুধু বুঝিতে পারিলাম না। আমি যখন তাহাদের পার্শ্ব দিয়া আসি তখন তাহাদের সকলের মুখেই বেশ একটু তীব্র সুরার গন্ধ পাইয়াছিলাম। তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম তাহারা সকলেই সুরা পান করিয়াছে। সুরা পান করাটাইতো দোষের,—তাহার উপর সুরা পান করিয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে আসা তো কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। পুটুরাম ও তাহার বন্ধুবর্গের এরূপভাবে এখানে সুরা পান করিয়া আসা আমার যেন কেন ভালো ঠেকিল না। আমি মনে মনে ঠিক করিলাম লীলা গৃহে আসিলেই বলিব, "সে যেন তাহার মাতাকে বলিয়া দেয় যে, উহারা যেন আর এমনভাবে এখানে সুরা পান করিয়া না আসে।" হায় তখন কি জানিতাম যে,—"যে দেবতার যে মন্ত্র"। সুরা পান ব্যতীত এরূপ স্থানে ভদ্র সন্তানের আসা অসম্ভব। মান, মর্য্যাদা, আত্ম সম্ভ্রব,—এমন কি জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত না হারাইলে মানুষ কিছুতেই এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা জানিয়া শুনিয়া সুরা পান না করিয়া সজ্ঞানে এসব স্থানে প্রবেশ করে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তাহারা কখনই মানুষ নহে,—নিশ্চয়ই তাহারা কোন

উপদেবতা। মানুষের সাধ্য নহে সুরা পান ব্যতীত এরূপ স্থানে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে। তাহাদের নারকীয় হাব-ভাব,—পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য যে মানুষ সে চোখ চাহিয়া কিছুতেই দেখিতে পারে না,—দেখা অসম্ভব। তাহা চোখের উপর দেখিলে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত ভগবান পর্য্যন্ত ভয়ে বিস্ময়ে সংকোচিত হইয়া উঠেন। আমি একাকী গৃহের ভিতর বসিয়া ঐ কয়টা লোকের কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। উহারা কেমন করিয়া ঠিক নিজের বাটীর মত জামাটামা খুলিয়া এমন সচ্ছন্দতার সহিত ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। কই আমি তো উহাদের মত পারি না। না পারিবার কারণ কি ? আমি এ সমস্যার কিছুতেই মীমাংসা করিতে পারিতেছিলাম না সেই সময় লীলা গৃহের বাহির হইতে দরজা দিয়া গলাটা বাড়াইয়া বলিল, "আমি গা ধুতে চল্লুম,—বসো যেন চলে যেওনা। আজ আর তোমার বাড়ী যাওয়া হবে না। এখানেই খেতে হবে।"

লীলা এই কয়টা কথা বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না—না তা কি করে হবে আমার এখানে খাওয়া হবে না। আমি তো বাড়ীতে কিছু বলে আসিনি।"

লীলা আমার কথায় একবার আমার মুখের দিকে চহিল। সে চাউনি রাগের না অনুরাগের তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইলে ঐ চাউনিটুকুর পরিবর্ত্তে সমস্ত পৃথিবী বোধ হয়

বিনিময় করা যায়। সে ঠোঁট দুইটা একবার ফুলাইয়া বলিল, "আমি তো আর কিছু জানি না, তোমাদের বাড়ীতে কে আছে যে বলে আসবে, তার চেয়ে বল না কেন,—আমাদের হাতে তুমি খাবে না,—আমাদের হাতে তোমার খেতে ঘেন্না করে?"

ইহাদের হাতে খাওয়া যে অন্যায়,—খাওয়া যে উচিত নয়, একথা আমার একবারও মনে হয় নাই, কিন্তু লীলার কথায় সে কথাটাও একবার বিদ্যুতের মত আমার প্রাণের ভিতর ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম, "না—না,—তা তুমি মনে ক'র না। তোমাদের হাতে খাবো তাতে আবার আপত্তি কি হ'তে পারে? তবে—তবে—"

লীলা কৃত্রিম ক্রোধের সহিত আমার কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "তবে টবে আমি তোমার কিছু শুন্‌তে চাইনি,—আজ এখানে তোমার খেতেও হবে,—থাক্‌তেও হবে। তা না হ'লে মা ভয়ঙ্কর রাগ কর্ব্বেন। মা এসে যখন তোমায় খেতে ব'ল্‌বেন তখন তো আর তাঁর কথা ঠেলে যেতে পার্ব্বে না।"

নিজের মা পৃথিবীতে যাহার ঋণ অপরিশোধনীয়,—যিনি মূর্ত্তিমতী ইষ্টদেবী তাঁহার কথা তো সেদিনও অনায়াসে ঠেলিয়া আসিয়াছি। তিনি বিবাহ করিতে বলিলেন, আমি স্পষ্ট তাঁহার মুখের উপর বলিয়া দিলাম, "না মা আমি এখন বিবাহ করিতে পারিব না।" কই তাহাতে তো কিছুমাত্র বাধে নাই। কিন্তু এ মায়ের কথা

ঠেলিয়া যাওয়া সত্যই অসাধ্য। আমি মনে মনে বুঝিলাম সত্যই তো আমি তাঁহার কথা কিছুতেই ঠেলিতে পারিব না। তিনি নিজে আসিয়া আমায় থাকিবার জন্য,—খাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন এইটুকুই যে তখন আমার নিকট স্ব-শরীরে স্বর্গলাভ অপেক্ষাও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। আমি কি তাঁহার কথা ঠেলিতে পারি? আমি লীলার কথার উত্তরে কি বলিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবনত মস্তকে মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। লীলা একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "তা'হলে তুমি একটু ব'স, আমি গা ধুয়ে এলুম ব'লে।"

লীলা চলিয়া গেল,—আমার মনে হইল আমার সমস্ত প্রাণটা যেন ফাঁকা হইয়া গেল। আমি একাকী বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার বিবেক আমার প্রাণের ভিতর হইতে আমাকে সজাগ করিবার জন্য বার বার যেন বলিয়া দিতে লাগিল, "এস্থান অতি কদর্য্য স্থান,—এস্থানে আসা কোন হিসাবেই উচিত নহে। এস্থানে মানুষ আসিলে তাহার সমস্ত মনুষত্ব লুপ্ত হয়। পৃথিবীতে যত প্রকার প্রলোভন আছে ইহার তুলনায় অন্যান্য সবই তুচ্ছ,—কিছুই নয় বলিলেই হয়। এ প্রলোভনে একবার মানুষ পড়িলে তাহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। ধীরে ধীরে সে একেবারে কর্ম্ম-জগতের বাহিরে যাইয়া পড়ে। বুদ্ধি, বিবেচনা, হিতাহিত জ্ঞান তাহার প্রাণে আর কিছুই

স্থান পায় না। একেবারে অপদার্থ হইয়া সে এই পৃথিবীতে পশু নাম গ্রহণ করে।" কিন্তু বিবেকের এই উক্তি পর মুহূর্ত্তেই কুমতির যুক্তির দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল,—সে যেন মহা হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "এস্থানের সহিতই বা আমার সম্পর্ক কি,—প্রলোভনের সহিতই বা আমার সম্পর্ক কি। আমি তো এখানে কোন কুঅভিপ্রায়ে আসি নাই। সরলা বালিকা পাপের পঙ্কিল গর্ভে নিমগ্ন হইতেছে,—যদি আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি তবে কি সেটা আমার মহাপুণ্য কার্য্য হইবে না? আমি যখন মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই তখন আমার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত যাহাতে এই বালিকা পাপের গর্ভে নিমগ্ন হইতে না পারে। এ সুবর্ণ কুসুম যদিও কর্ম্মফলে এই কলুষিত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এখনও পাপের কীট ইহাতে দংশন করিতে পারে নাই। নির্ম্মল কুসুম এখনও ঠিক নির্ম্মলই আছে। এখনও ইহা দেবতার পূজায় উৎসর্গ করা যায়। পাপের জ্বালাময় দংশন এ কুসুম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। যাহাতে এ কুসুম অকালে ঝরিয়া না যায় তাহাই লক্ষ্য রাখা আমার জীবনের এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। এই সকল চিন্তার ভিতর আমি এমনি বিভোর হইয়াছিলাম যে, কখন্ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহাও আমি জানিতে পারি নাই। রজনীর কালো অন্ধকার গৃহের গবাক্ষের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানাকে একেবারে

নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে তাহাও আমার খেয়াল ছিল না। আমি নিজের মনেই চিন্তা করিতেছিলাম,—সেই সময় লীলার স্বরে আমি চমকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিলাম। লীলা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বা, তুমি তো বেশ মজার লোক। অন্ধকারে চুপ ক'রে বসে আছ তবু আলোটা জ্বেলে নিতে পারনি।"

লীলার কথায় আমি আশে পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম সত্যই তো রাত্রের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় গ্যাস অনেকক্ষণ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার আলো গৃহের গবাক্ষের ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। লীলা আর কোন কথা না বলিয়া গৃহের আলো জ্বালিয়া দিল। মূল্যবান কেরোসিন ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয়, সঙ্গে সঙ্গে গৃহের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গেল। লীলা প্রাচীর গাত্রস্থিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার নিজের দেহটা দেখিয়া লইল,—তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। তখন পার্শ্বের গৃহ হইতে পুটুরাম ও তাহার বন্ধুবর্গের মাঝে মাঝেই বিকট হাসির হর্‌রা উঠিতেছিল। লীলা আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিবার পর দুই একটা কথা হইবার পরই আমি বলিলাম, "দেখ তা'হলে আজ আমি এখন যাই,—কা'ল আবার আস্‌বো। আজ তোমাদের বাড়ীতে পুটুরাম বাবুর বন্ধুরা খাবেন, আজ আমার থাকা উচিত নয়।"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুব উচিত। পুটুরাম বাবুতো আর আমাদের পর নয়। ও কে জান ত ?"

আমি উত্তর দিলাম, "কেন জানবো না তুমিই তো বলে ছিলে,—উনি তোমাদের জামাই। বোধ হয় তোমার সম্পর্কে কোন বোনের স্বামী হবেন।"

আমার কথায় লীলা একেবারে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—সে হাসিতে হাসিতে বিছানার উপর একেবারে গড়াইয়া পড়িল। আমি তাহার হাসিতে মহা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার কোন খানটায় যে ভুল হইল তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি অবাক ভাবে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, লীলা প্রায় দশ মিনিট হাসিবার পর কোন ক্রমে হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, "আমার বোনের স্বামী হ'তে যাবে কেন,—পুটুরাম বাবু যে আমার মার বাবু,— তা বুঝি তুমি জান না ?"

পুটুরাম বাবু যে লীলার মার বাবু তাহা সত্যই এত দিন জানিতাম না আর কেমন করিয়াই বা জানিব। পুটুরামের বয়স বাইশ তেইশ বৎসরের অধিক নহে আর লীলার মার বয়স প্রায় চল্লিশ। এ অবস্থায় পুটুরাম যে লীলার মার বাবু তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব। আমি লীলার কথার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিলাম, "না,—পুটুরাম বাবু যে তোমার মার বাবু তা আমি জানতুম্ না।"

সেই সময় পার্শ্বের গৃহ হইতে পুটুরামের দলের একটা বিকট হাস্য একটা অশ্লীল গানের ভিতর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া আমাকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। এমন গান,—এমন হাসি আমি জীবনে আর কখন শুনি নাই। আমার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না,—আমি অবাক্ হইয়া লীলার মুখের দিকে চাহিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লীলা আমার হাতের আঙ্গুলগুলা লইয়া খেলা করিতেছিল,—আমাকে অবাক ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া সে আবার আমায় কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, সেই সময় লীলার মাতা টলিতে টালিতে আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহখানা বিকট সুরার তীব্র গন্ধে ভরিয়া উঠিল। তাহার পা ক্রমাগত টলিতেছিল, তাহার সংযত বস্ত্র ক্রমাগত অসংযত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে গৃহে প্রবেশ করিয়া পাপের জ্বলন্ত মূর্ত্তির মত মহাকষ্টে গৃহের প্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার এরূপ অবস্থা আর পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই,—কখন যে এরূপ অবস্থা দেখিব তাহাও জীবনে কোন দিন আশা করি নাই। ঘৃণার আমায় সমস্ত দেহটা একেবারে কাঁটা দিয়া উঠিল। আমার সমস্ত প্রাণ এই পাপ স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এ পাপের মূর্ত্তির দিকে চাহিতে আমার যেন কেমন সাহসে কুলাইল না,—আমার মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িল। হয়তো আমি তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম,—কিন্তু লীলার মুখের দিকে চাহিয়া,—লীলার কথা ভাবিয়া

আমার আর সে স্থান পরিত্যাগ করা হইল না,—আমি পাষাণের মত সেইস্থানেই বসিয়া রহিলাম। লীলা তাহার মাতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহা বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি আবার এ ঘরে এলে কেন মা? যাও না ও ঘরে।"

লীলার মাতা তাহার কন্যার প্রতি একটা কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, "আমার বাবার কাছে আমি দুশো বার আসবো। তুই বেটী কি কম হারামজাদী,—তুই ভদ্র লোকের কি ইজ্জৎ জানিস,—না তাদের যত্ন জানিস্।"

লীলার মাতা এই কয়টা কথা বলিতে বলিতে গৃহের দরজার চৌকাটের উপর জাকিয়া বসিল,—আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাবা—এ মেয়েটার সব ভার তোমার উপর দিয়েছি,—বেটী বড় বদমাইস্। বেটীকে তোমায় ঢিট্ করে দিতে হবে। তোমারা হলে ভদ্রলোকের ছেলে তোমরা যে আমাদের বাড়ী এস এ কি আমাদের কম ভাগ্যির কথা।"

সুরার উগ্র তেজে লীলার মাতার কণ্ঠ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল,—তাহার এই জড়ান জড়ান কথাগুলা আমার যেন উগ্র বিষের মত ঠেকিতে লাগিল। আমি নীরবে ঘাড় হেট করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া আমি যে তাহার মাতার অবস্থায় বিশেষ বিরক্ত হইয়াছি লীলা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কেন না আমি লীলার ভাব দেখিয়া বেশ

বুঝিলাম, যে সে তাহার মাতার এই অবস্থায় এই গৃহে প্রবেশ করায় কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। সে এবার বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি আবার এ ঘরে এলে কেন মা? যা সহ্য কর্ত্তে পারো না সে বিষ খাও কেন? যাও এ ঘর থেকে, তোমার জন্য আমার লোকের সাম্‌নে মুখ দেখাবার যো নেই।"

লীলার কথায় লীলার মাতাও বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে জড়িত কণ্ঠে মহা বিরক্ত স্বরে উত্তর দিল, "নে-নে তুই বেটী থাম্, এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই, আবার মুখের উপর চোপা। আমি তোর কথায় কি ধার ধারি লা। আমি মদ খাবো যা ইচ্ছে কর্ব্বো,—তোর কি। ঝেটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দেব।"

আমার সম্মুখে মাতার এই কর্কশ কণ্ঠে লীলা ক্রমেই এমনই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেছিল,—যে তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইবার মত হইল। সে তাহার মাতার কথায় কোন উত্তর দিল না.—মুখখানা মলিন করিয়া তীব্র চক্ষে তাহার মাতার দিকে চাহিয়া রহিল। লীলার মাতা বলিতে লাগিল, "আমায় আসেন উনি শাসন কর্ত্তে। বেটী কি লায়েক রে? তোমার বরাতে অনেক আছে,—তুমি থাক বেটী।"

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি বাবা কিছু মনে করো না, ও বেটী জানোয়ার। ও বেটীকে মুখে হবে না,—শুধু—"

লীলার মাতা কথাটা শেষ করিতে পারিল না, পুটুরাম টলিতে টলিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার গৃহ প্রবেশের শব্দে আমি দরজার দিকে চাহিলাম। তাহার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আমি একেবারে অবাক। তাহার সেই কালো কালো ছিপ্‌ছিপে দেহটা সুরায় লক্‌লক্ করিতেছে। গায়ে কেবল মাত্র একটা ফতুয়া, স্কন্ধের উপর একখানা তোয়ালে। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র লীলা ক্রন্দন স্বরে বলিল, "দেখ্‌না জামাই, মা শুধু শুধু এ ঘরে এসে আমায় যা তা বক্‌ছে।"

পুটুরাম হাত নাড়িয়া বলিল, "তুই চুপ কর, আমি তোর মাকে নিয়ে যাচ্ছি,—দেখ্‌ছিস্‌নি মাতাল হয়েছে।"

পুটুরামের কথায় লীলার মাতার স্বরটা একেবারে সপ্তমে বিকট ভাবে বাহির হইয়া আসিল, "মাতাল হয়েছে যে বেটী তার নাম জানিনি। মাতাল,—কিসের মাতাল? বেটা পীরিত আমি তোমার বার কর্ব্বো।"

পুটুরাম লীলার মাতার হাত ধরিয়া বাঁকা গলায় বলিল, "কি হচ্ছে, জামাই রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না,—চল ও ঘরে।"

পুটুরাম লীলার মাতাকে ধরিয়া ও ঘরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু লীলার মাতা সবলে তাহার হাতখানা পুটুরামের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "তুই বেটার ছেলে থাক্,—তোরও মুরোদ যা তা আমি বুঝি। এ বুদী বাড়ীওয়ালী

কারুর তোয়াক্কা রাখে না। তুইও ব্যাটা কি কম পাজি, তোকেও এবার দূর কর্ব্বো।”

পুটুরাম বিরক্ত স্বরে বলিল, “কি হচ্ছে, চল ও ঘরে। সব সময় মাত্‌লামী। জামাই বসে আছে তা হুস্‌ নেই।”

“হুস খুব আছে চাঁদ।” লীলার মাতা পুটুরামের দিকে একবার কষ্টে চাহিল তাহার পর আবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, “বাবা তুমি বিরক্ত হ’চ্ছ আমি যাচ্ছি, কিন্তু তোমার উপর এই ভাব রইলো তুমি এই বেটীকে ঢিট্‌ কর্ব্বে। বেটী বড় বাড় বেড়েছে।”

লীলার মাতা আবার টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পুটুরাম তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। লীলার মাতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, “আজ কিন্তু বাবা তোমার যাওয়া হবে না,—তোমায় এখানে খেতে হবে।”

লীলার মাতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত গৃহটা যেন একটা নরকের ভিতর ডুবিয়াছিল,—এতক্ষণে আবার ভাসিয়া উঠিল। আমি লীলার মুখের দিকে চাহিলাম। মাতার এই কাণ্ড কারখানায় সে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। আমাকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে জোর করিয়া একটু মৃদু হাসিল। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, “তা’হলে আজ এখন আমি উঠি রাত অনেক হয়েছে,—আবার কা’ল আস্‌বো।”

লীলা আমার হাতখানি ধরিয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না,—আজ আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না। আজ তোমাকে এখানে থাক্‌তেই হবে।"

লীলার মাতার অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার মনটা যেন কেমন আপনা হইতেই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল,—আমার থাকিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না কিন্তু লীলার কথার উত্তরে থাকিব না একথাটা আমার কণ্ঠ হইতে কিছুতেই বাহির হইল না। কাজেই সে রাত্রি আমায় লীলাদের বাটী থাকিতে হইল,—তাহাদের পাক রন্ধনও খাইতে হইল। এই আমার এরূপ স্থানে প্রথম রাত্রি বাস ও ইহাদের হস্তের রন্ধন দ্রব্য আহার। সেদিন রাত্রে আমার একটুও নিদ্রা হয় নাই,—দুই শতবার ভাবিয়াছি,—না বাড়ী ফিরিয়া যাই। কিন্তু প্রলোভন আমায় এমনই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল যে আমার হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছুতেই আমি উঠিয়া যাইতে পারি নাই। তাহার পর হইতে প্রায়ই আমি লীলাদের বাড়ীতে রাত্রি বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে রাত্রে বাটীতে আহারও বন্ধ হইল। আহার ও শয়ন দুই-ই লীলাদের বাটীতে চলিতে লাগিল। মন প্রাণে আর কিছুতেই কোন দ্বিধা রহিল না। আমি যতই নরকের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলাম ততই বোধ হয় আমার সমস্ত মনটা কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল। কারণ সেস্থানের আর কিছুই আমার চক্ষে কুৎসিত ঠেকিত না। সবই যেন

স্বাভাবিক,—সবই যেন সুন্দর। এটা যে দোষের, এইটা যে অন্যায় একথা একবারও মনে স্থান পাইত না। যদিও বা কোন দিন মনে হইত তখনই অমনই যুক্তির দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতাম। আমরাও মানুষ,—ইহারাও মানুষ,—ইহারাও সেই বিধাতার সন্তান; তখন আমাদের ইহাদের ঘৃণা করিবার কি অধিকার আছে। সমাজ ইহাদের ঘৃণা করে,—কেননা ইহারা সমাজে পাপের স্রোত প্রবাহিত করে,—কিন্তু তাহাতে কি ইহাদের দোষ, না সমাজের দোষ? সমাজ যদি ইহাদের ঘৃণা না করে,—ইহাদের যদি বুকে তুলিয়া লয় তাহা হইলে তো আর ইহারা পাপের মূর্ত্তিমতী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে না। আমি ইহাদের সহিত মিশিব,—ইহাদের বুকে তুলিয়া লইব,—পাপের জ্বলন্ত অনল হইতে যদি ইহাদের একটীকেও রক্ষা করিতে পারি তবে জীবন স্বার্থক জ্ঞান করিব। আমি তো দুর্ব্বল নই যে সমাজের ভ্রুকুটী দেখিয়া ভীত হইব। হায়! তখন তো বুঝি নাই যে, ভগবানের সৃষ্টিরহস্য বৈচিত্রময়। তিনি যাহা কিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তো উদ্দেশ্যহীন নহে। এই মায়াময় পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য প্রলোভনের মূর্ত্তিমতী জীবন্ত প্রতিমা করিয়া বারনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের ধর্ম্মই যে প্রতারণা—প্রবঞ্চনা। দয়া মায়া ভালবাসা প্রেম প্রীতি ইহাদের হৃদয়ে কি স্থান পাইতে পারে? অগ্নির ধর্ম্ম দগ্ধ করা, সে চিরদিন দগ্ধই করিবে,—তাহার স্পর্শে কেহ কি কোনদিন শীতল হইতে

পারে? আমার এই অধঃপতনের কথা আমি ভাবিয়াছিলাম কেহ জানিতে পারে নাই,—কিন্তু তাহা নহে, একথা গোপন ছিল না। কলেজে আমার সহপাঠী বন্ধুবর্গ এই বিষয় লইয়া আমাকে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত কিন্তু আমি সে কথা শুনিয়াও শুনিতাম না। আজ এক বৎসর হইতে লীলার সহিত আমার আলাপ হইয়াছে এই এক বৎসরের ভিতর একদিনের জন্যও আর দেশে যাই নাই। মা এই এক বৎসরের ভিতর বোধ হয় দেশে যাইবার জন্য একশত খানা পত্র ও পঞ্চাশখানা টেলিগ্রাম করিয়াছেন। আমি তাহার কিছুই ভ্রুক্ষেপ করি নাই। আমি লীলার প্রেমে একেবারে অন্ধ হইয়াছিলাম। বি, এ, পরীক্ষাও নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল কিন্তু আমি এই এক বৎসরের ভিতর এক দিনের জন্যও বই খুলিবার অবসর পাই নাই। কাজেই এই বৎসর পরীক্ষা দিব কিনা ভাবিতেছিলাম এমন সময় হঠাৎ এক দিন দেশ হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম,—গত কল্য খুড়া মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে,—আমাকে অবিলম্বে দেশে রওনা হইতে হইবে। এ অবস্থায় দেশে না গেলেই নয় কাজেই আমি লীলাকে সমস্ত বলিয়া তাহার নিকট হইতে এক মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতার বাটী তুলিয়া দিয়া এক বৎসরের পরে আবার দেশে রওনা হইলাম। সত্য কথা বলিতে কি তখন যদি লীলা একবার আমাকে দেশে যাইতে নিষেধ করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সে সময়ও

দেশে যাইতাম না। কিন্তু আমার মুখে আমার খুড়া মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সে একরূপ জোর করিয়া আমাকে তখনই দেশে রওনা করিয়া দিল। তাহারই আগ্রহ আতিশয্যে আমাকে বাধ্য হইয়া সে দিন দেশে রওনা হইতে হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক বৎসর পরে বাড়ী আসিলাম। বাটীর দ্বারে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার পা দুইখানা যেন কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত বাড়ীখানা যেন একটা প্রকাণ্ড শোকের কালিমায় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। খুড়া মহাশয়ই ছিলেন আমাদের সংসারের কর্ত্তা, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে থাকিয়া আমরা এত বড়টা হইয়া উঠিয়াছি। সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট এক দিনের জন্যও আমাদের গায়ে লাগিতে পারে নাই। তিনি যেমন হিসাবী, তেমনি বুদ্ধিমানও ছিলেন। তিনি এযাবৎকাল এমনি গুছাইয়া আমাদের সংসারটা চালাইয়া আসিতেছিলেন যে, আমাদের তো কোন অভাবই ছিল না তাহা ছাড়াও তিনি মৃত্যুর সময় আমাদের জন্য একরাশ টাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। খুড়া মহাশয়ের পুত্র কন্যা কিছুই ছিল না,—খুড়ীমাও বহুদিন মারা গিয়াছিলেন,—আমাদের সংসারে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেবল আমার মা ও দূর সম্পর্কীয় কয়েকজন আত্মীয় বিধবা ললনা ছিলেন। খুড়া মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দিকটা একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। আমাদের সংসারে পুরুষের মধ্যে রহিলাম আমি,—কাজেই এক্ষণে আমাকেই সংসারের রজ্জু ধরিতে হইবে। পিতা ও খুড়া মহাশয় যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও নিতান্ত

অল্প নহে,—আমিই যখন তাহার একমাত্র মালিক তখন আমারই তাহা দেখা শুনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমি দেশে আসিয়াছি বটে কিন্তু আমার প্রাণতো সঙ্গে আসে নাই। সে যে কলিকাতায় পড়িয়া আছে। যখন আমার দেশে থাকা অসম্ভব তখন এ অবস্থায় খুড়া মহাশয়ের এরূপ হঠাৎ মারা যাওয়াটাই যে নিতান্ত অভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছে তাহা মুখে কাহাকেও না বলিলেও আমার মনে তুই শত বার উদয় হইতে লাগিল।

আমি বাড়ী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে খুড়া মহাশয়ের শোকটা আবার যেন নূতন করিয়া চাগাড় দিয়া উঠিল। আমার বাটী আসিবার সংবাদটা অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা শোকের ক্রন্দন অন্তঃপুর মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত বাড়ী-খানা একেবারে আলোড়িত করিয়া দিল। আমার আর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার সাহস হইল না,—বাহির মহলের উপরের বৈটকখানার ঢালা ফরাশের উপর আড় হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি খুড়া মহাশয়ের পুত্র কন্যা নাই,—আমিই তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী,—আমাকেই তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কাজেই সেই দিনই আমাকে স্নান করিয়া কাছা ধারণ করিতে হইল,—আমার আর এক মাসের ভিতর কলিকাতায় যাইবার পথে একেবারে যেন একটা কাঁটা পড়িয়া গেল।

আমাদের দেশের ভিতর খুড়া মহাশয়ের খুব নাম ডাকটা ছিল। আমার আত্মীয় স্বজন,—দেশের মুরুব্বীদিগের ভিতর তাহার শ্রাদ্ধটা যাহাতে তাহার নাম ও সম্মান অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয় তাহারই আলোচনা পড়িয়া গেল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একজন না একজন এ বিষয় পরামর্শ দিবার জন্য আমার নিকট ক্রমাগত আসিতে লাগিল কিন্তু সে পরামর্শ শুনিবার বা যে বিষয় চিন্তা করিবার আমার ফুরসুৎ কোথায়? আমার সমস্ত প্রাণটা লীলাময় হইয়া গিয়াছিল। লীলার জন্য আমার প্রাণটা বলির ছাগের মত দিন রাত্র ছটফট করিতে লাগিল। তাহাকে একবার দেখিবার জন্য,—তাহার নিকট ছুটিয়া যাইবার জন্য আমি একেবারে পাগল হইয়া উঠিলাম। খুড়া মহাশয়ের শ্রাদ্ধের আলোচনা করা সে সময় কি আমায় ভালো লাগিতে পারে,—না ভালো লাগা সম্ভব। তাহাদের বাজে পরামর্শে আমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে তিতি-বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল,—কিন্তু মুখের উপর কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতাম না। কারণ সকলেই আমাপেক্ষা বয়সে অনেক বড়,— সকলেরই মস্তকে পক্ক কেশ। তাহাদের জ্বালায় নির্জ্জনে বসিয়া লীলার কথা দুই দণ্ড ভাবিবারও অবসর পাইতাম না। আমি প্রাণপণ শক্তিতে আমার প্রাণের জ্বালা প্রাণে লুকাইয়া কেবল মাত্র হুঁ হাঁ দিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতাম। ক্রমে খুড়া মহাশয়ের শ্রাদ্ধের দিনটা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল,—শ্রাদ্ধটা

তাহার নাম ও সম্মানের মত খুব ধুমধামেই সম্পন্ন হইল। মা এ বিষয়ে একবারে মুক্ত হস্ত হইয়া ছিলেন,—তাঁহাকে যে যাহা বলিল তিনি কোন টাতেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। এ শ্রাদ্ধের আমি ছিলাম যেন এক একটা কলের পুতুল। আমাকে যে যাহা বলিতেছিল আমি পুতুলের মত কেবল তাহা করিয়া যাইতে ছিলাম। যাক অনেক কষ্টে শ্রাদ্ধ চুকিল,—আমি ধড়া চুড়া ফেলিয়া বাঁচিলাম। লীলাকে দেখিবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণ একেবারে পাগল হইয়া উঠিল,—এই এক মাস লীলাকে না দেখিয়া যে আমি কি কষ্টে কাটাইয়া ছিলাম তাহা কেবল অন্তর্য্যামী বলিতে পারেন। ইতি মধ্যে আমি লীলার দুইখানি পত্র পাইয়া ছিলাম,—যদিও তাহাতে আমাকে যাইবার জন্য কিছু স্পষ্ট লেখা ছিল না কিন্তু আমি তাহার পত্র পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম,—সেও আমায় দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে।

এই এক মাসের ভিতর আমার মার সহিত কোন কথা হয় নাই,—শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে তিনি শ্রাদ্ধের গোলেযোগে ব্যস্ত হইয়া ছিলেন,—শ্রাদ্ধের পর আবার জমিদারী সংক্রান্ত নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমি আর কিছুতেই সবুর করিতে পারি না। মা একটু সুস্থির হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আর আমার কিছুতেই ধৈর্য্য রহিল না। আর ধৈর্য্য ধরিতে গেলে আমাকে সত্যই পাগল হইতে হইত। আমি মনে মনে স্থির

করিলাম আজ যেমন করিয়া হউক একটু অবসর করিয়া মাকে বলিয়া আজ রাত্রের গাড়ীতেই কলিকাতায় রওনা হইব। সকাল হইতে এই কথাটা মাকে বলিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বলিবার মত একটুও সুবিধা পাইলাম না। মানুষ একাগ্রচিত্তে যাহা চায় ভগবান নিজে তাহা হাতে করিয়া তুলিয়া দেন। সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মাকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া আমি অবসন্ন চিত্তে নিজের ঘরের ভিতর পালঙ্কের উপর পড়িয়া কেমন করিয়া কথাটা মাকে বলি মনে মনে তাহারই একটা উপায় স্থির করিতে ছিলাম সেই সময় মা আমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম তিনি এই মাত্র আহার শেষ করিয়া উপরে উঠিয়াছেন। এই অবসর,—এ অবসর ত্যাগ করিলে আর বলা হইবে না। মার গৃহ প্রবেশের পদশব্দেই আমি পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলাম,—মা আমার দিকে না চাহিয়াই তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলিতে যাইতেছিলেন,—বোধ হয় কোন কাগজ পত্র দেখিবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমি তাহাকে বাধা দিলাম,—অবনত মস্তকে মৃদু কিন্তু স্বরে বলিলাম, "মা,—আমি ভাব্‌ছি আজ একবার কলিকাতায় যাব।"

আমার কথাটা মায়ের কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি যেন একেবারে চমকাইয়া দাঁড়াইলেন,—বেশ একটু অবাক্ ভাবে

আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে এর মধ্যে আবার কলকাতায় যাবি কেন? এখন তোর আর কলকাতায় যাওয়া হবে না। এ বছর যখন এগ্‌জামিনই দিলিনি তখন এত তাড়াতাড়ি আবার কল্‌কাতায় যাবি কি কর্ত্তে? না বাছা এখন কি তোর কল্‌কাতায় যাওয়া হয়! ঠাকুর পো, নেই, বিষয় সম্পত্তি গুলো তোকেই তো সব বুঝে পোড়ে নিতে হবে। পরের ওপর ভার দিলে কি কিছু থাকে দু'দিনে সব উড়ে পুড়ে যায়।"

পরের উপর নির্ভর করিলে দুইদিনে সব উড়িয়া পুড়িয়া যায় একথা যে না বুঝিতাম এমন নহে। কিন্তু আমার দেখিবার অবসর কোথায়? লীলার প্রেমের বিষ তখন আমার মাথায় উঠিয়াছিল,—প্রলোভন আমাকে একেবারে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। আমি হঠাৎ মায়ের কথার উত্তরে বলিয়া বসিলাম,—"দু'দিন চারদিনে আর এমন কি উড়ে পুড়ে যাবে। অন্ততঃ পক্ষে দু'চার দিনের জন্যও আজ আমাকে একবার কল্‌কাতায় যেতেই হবে। আমার একজন লোকের সঙ্গে দেখা না কল্লেই নয়।"

মা আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন,—আমি নীরব হইবা মাত্রই তাহার কণ্ঠ হইতে একটা গম্ভীর স্বর বাহির হইল, "নীরু তুই যে কল্‌কাতায় কেন যেতে যাচ্ছিস্ তা আমি জানি। তুই কল্‌কাতায় গিয়ে যে একেবারে উৎচ্ছন্ন গিয়েছিস

সে খবরও আমি পেয়েছি। তুমি এ বছর যে কেন বি, এ, এগ্‌জামিন দিতে পাল্লিনি সে খবরও এখানে এসেছে। তোর বয়স হয়েছে,—বুদ্ধি হয়েছে,—এখন আর তোকে বল্‌বার কিছু নেই। তুই যা ভালো বুঝিস্‌ তাই কর্ত্তে পারিস্‌।' আমি কোন দিনই তোকে কিছু বলিনি আজও কিছু বল্‌বো না। তুই নিজে উচ্ছন্ন যা,—নিজের মুখে দু'হাতে চুণ কালি মাথ্‌ তাতে কারুর কিছু বল্‌বার অধিকার না থাকতে পারে কিন্তু তুই যে তোর বাপের মুখে,—তোর বংশের মুখে দু'হাতে চুণ কালি লেপ্‌বি তা আমি কিছুতেই সহ্য কর্ব্বো না।"

কথাগুলা বলিতে বলিতে মায়ের সমস্ত মুখখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিল,—আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না,—মস্তক অবনত করিলাম। কেমন যেন একটা ক্রোধের প্রচণ্ড বহ্নি আমার সমস্ত ভিতরটা একেবারে দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এ ক্রোধটা যে কিসের বা কাহার উপর তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার পাপের কাহিনী যে এতদূর ছুটিয়া আসিতে পারে তাহা আমি কোন দিনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই,—এ কথা যে কোন দিন মা শুনিতে পারেন তাহা কি কোন দিন মানুষে কখনও ভাবিতে পারে? মানুষ যখন পাপের পথে ছুটিতে থাকে তখন সে ভাবে তাহার ন্যায় চতুর বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। সে যে পাপ করিতেছে তাহা এমনই চতুরতার

সহিত করিতেছে তাহা মানুষ দূরের কথা,—ভগবানও জানিতে পারিতেছেন না। কিন্তু হায় তাহা যে নয়,—পাপের বাতাস যে প্রতি মানুষের কাণে কাণে সব কথা বলিয়া যায় ইহা যদি একবারও তাহারা বুঝিতে পারে তাহা হইলে কি আর তাহারা পাপের পথে একপাও অগ্রসর হইতে পারে। তুমি যতই চালাক হও, যতই চতুরতার সহিত পাপের পথে অগ্রসর হও পাপ কিছুতেই গোপন থাকে না,— পাপ গোপন থাকিবার নহে।

কথাটা শেষ করিয়াই মা গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন,—কি ভাবিয়া তিনি আবার দরজার নিকট হইতে ঘুরিয়া দাড়াইয়া বলিলেন, "দেখ্ তুই লেখাপড়া শিখিছিস্,—জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তোর কি এমন মতি গতি হওয়া ভালো। পাপের ওপর যাদের প্রতিষ্ঠা,—প্রবঞ্চনা যাদের ধর্ম্ম তারা কি কখন ভাল হ'তে পারে। পাপের সংস্পর্শে থাক্‌লে কোন মানুই ভালো থাক্‌তে পারে না,—কেমন করে ভাল থাক্‌বে পাপের ছবি দেখে দেখে তাদের চোখ ভরে যায়,—তারা ভাবে এই ছবির চেয়ে বুঝি জগতে আর কোন ছবি সুন্দর নেই। পুণ্যের ছবি দেখ্‌বার তারা আর একদিনের জন্যে চেষ্টাও করে না। কিন্তু পুণ্যের ছবি যে কত সুন্দর তাতো মুখে বলা যায় না। যা দেখ্‌বার জন্যে স্বয়ং ভগবান আকুল হয়ে থাকেন। সে যাক্ আমি তোর মা আমার কথা শোন্,—আমি যা বল্‌বো তা কখনই তোর অমঙ্গলের

জন্যে বল্‌বো না। বিয়ে করে ঘর সংসার কর,—পূর্ব্ব পুরুষের নাম বজায় হ'ক। যুক্তি দিয়ে পাপকে ঢাক্‌বার চেষ্টা করিস্‌নি,—তাতে কোন দিনই শান্তি পাবিনি,—কোন দিনই সুখী হতে পার্ব্বিনি।"

আমি অবনত মস্তকে মায়ের কথাগুলি শুনিতেছিলাম, তাঁহার এক একটী কথা আমার বুকের দরজায় যাইয়া সবলে ধাক্কা দিতে লাগিল। তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার মত আমি কোন কথাই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। লীলার প্রেমে আমি যদি জ্ঞান না হারাইতাম,—যদি আমার একটুও চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে আমার শুধু লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমার তো চৈতন্য ছিল না কাজেই আমার তাহাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ হইল না। মাতা নীরব হইবামাত্র আমি বলিলাম, "মা,—তুমি এসব ভুল শুনেছ, তুমি এসব কথা যা'র মুখে শুনেছ সে নিশ্চয়ই আমার শত্রু। তুমি যা ভাবছ তা' নয়,—কল্‌কাতায় আমায় যেতে হবে বটে,—কেননা আমি আমার এক বন্ধুকে কথা দিয়ে এসেছি। তার বিয়ে আমার না গেলেই নয়।"

মা আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন;—বলিলেন, "একটা মিছে ব'লে আর পাপ ঢাক্‌বার চেষ্টা করিস্‌নি। আমি যা' বলি শোন,—কল্‌কাতাই হ'লো তোর যত সর্ব্বনাশের মূল। কল্‌কাতা আর জীবনে কখন মাড়াস্‌নি। দেশে থাক পূর্ব্বপুরুষের নাম

যা'তে বজায় থাকে তাই কর, তোর অভাব কি? বিয়ে থা কর্ ছেলে-পিলে হ'ক্ দেখ্‌বি কত শান্তি পাবি।"

আমার তখন কাণ্ডজ্ঞান কিছুই ছিল না,—আমি জননীকে আর কথা কহিতে দিলাম না,—তাঁহার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "তুমি যদি মা না বোঝ তা'হলে আর আমি কি করছি বল। আমি যখন কথা দিয়ে এসেছি তখন আমি যাবই। আমি কারও কথা শুন্‌বো না।"

আমার কথায় মায়ের সমস্ত মুখখানা রাগে যেন একেবারে লাল হইয়া উঠিল,—তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে অতি তীব্রভাবে চাহিয়া বলিলেন, "মানুষ যখন উচ্ছন্ন যায় তখন এমনি ভাবেই যায়। আমি তোকে কোন কথা আর বল্‌তে চাইনি,— তোর যা ইচ্ছে হয় কর্‌গে যা। আমারই বা এত জ্বালায় কাজ কি,—তুই যদি কল্‌কাতায় আমার কথা না শুনে যাস্, আমিও কাশী চলে যাব। আমার অদৃষ্ট মন্দ না হ'লে তোর মত ছেলে পেটে ধরি।"

ক্ষোভে দুঃখে মা আর কথা কহিতে পারিলেন না,—তীব্র বেদনায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাঁহার নয়ন বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া সেই সময় টুকুর জন্য আমার প্রাণটা যেন কেমন খারাপ হইয়া গেল। একবার একথাও মনে হইল

যে মায়ের প্রাণে কষ্ট দিয়া না হয় কলিকাতায় নাইবা গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই লীলার সেই সরল সুন্দর মুখখানি আমার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিয়া সমস্ত বাধা বিঘ্ন নিমিষে প্রাণ হইতে দূর করিয়া দিল। মায়ের চোখের জল,—এত কাকুতি মিনতি সকলই বৃথা হইয়া গেল। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই রাত্রের গাড়ীতেই কলিকাতায় রওনা হইলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমি যখন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন উষারাণী প্রভাত সমীরণে নাচিয়া নাচিয়া কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত কলিকাতা নগরীকে নিদ্রার কোল হইতে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। ট্রেণ আসিয়া সিয়ালদহ ষ্টেসনের ভিতর প্রবেশ করিল। ষ্টেসনের সব কয়টা আলো জলজল করিয়া জ্বলিয়া যেন আরোহীগণকে বলিয়া দিতে লাগিল, এই কলিকাতা এই কলিকাতা। আমার সঙ্গে বিশেষ কোন মাল পত্র ছিল না,—কেবল একটা ছোট বেডিং ও একটা ছোট ষ্টীলট্রাঙ্ক। ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম ও একজন কুলিকে ডাকিয়া আমার বেডিং ও বাক্সটী নামাইতে বলিলাম। কুলি বেডিং ও বাক্সটী গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল।

কলিকাতায় আমি পূর্ব্বে যেখানে বাস করিতেছিলাম, এবার বাড়ী যাইবার সময় সে বাড়ীখানা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিলাম। এক্ষণে সিয়ালদহ ষ্টেসনে নামিয়া আমি কোথায় যাইয়া উঠিব সেই চিন্তাটাই আমার প্রধান হইল। একবার ভাবিলাম এখান হইতে বরাবর একেবারে লীলাদের বাড়ী গিয়া উঠি,—কিন্তু তাহাতে মনে কেমন দ্বিধা দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। কুলি আমাকে প্লাটফরমের

বাহিরে যেখানে ভাড়াটিয়া গাড়ী সকল দাঁড়াইয়া থাকে সেইখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। আমি এক্ষণে যে কোথায় গিয়া উঠিব তাহা চিন্তা করিবারও অধিক সময় পাইলাম না। তাহা ছাড়া লীলাকে দেখিবার জন্য তখন আমার প্রাণ এমনই ব্যাকুল হইয়াছিল যে সে চিন্তা করিবারও আমার ক্ষমতা ছিল না। আমি সম্মুখে যে গাড়ী দেখিলাম তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম,—গাড়ওয়ান মাল পত্র গাড়ীর ছাদে তুলিয়া লইল। আমি আর বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াই গাড়য়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহৎ-আশ্রম।"

গাড়ী মহৎ-আশ্রমের দিকে ছুটিল। কলিকাতায় দশ বৎসর বাস করিয়া মহৎ-আশ্রমে যে সর্ব্বদাই বাসস্থান পাওয়া যায় সেটুকু আমি জানিতাম। গাড়ী মহৎ-আশ্রমের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে আমি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলাম। আশ্রমের দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইতেই দেখিলাম আশ্রমের ভৃত্য দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে আমার জিনিষপত্র গুলো উপরে লইয়া যাইতে বলিয়া গাড়য়ানকে গাড়ী ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। গাড়য়ান আবার ভাড়ার চেষ্টায় ষ্ট্রাণ্ডের দিকে চলিয়া গেল।

আমি মহৎ-আশ্রমের একটা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। এবার যে অধিক দিন কলিকাতায় থাকিতে পারিব না, তাহা বাটী হইতে বাহির হইবার সময়ই ঠিক করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। কারণ আসিবার সময় বাটীর কাহাকেও কিছু বলিয়া আসি নাই।

মাকে কোন কথা না বলিয়া এমন ভাবে কলিকাতায় চলিয়া আসায় তিনি যে ভয়ঙ্কর রাগ করিবেন তাহা মনে মনে বুঝিয়াছিলাম কিন্তু বুঝিলে কি হইবে,—আমার থাকিবার উপায় ছিল না। প্রলোভনের টান সে বড় ভয়ঙ্কর টান। সে টানে যিনি না পড়িয়াছেন তিনি কিছুতেই বুঝিবেন না মানুষ সব ছাড়িয়া এই টানের মুখে নিজেকে এমন করিয়া কেমন করিয়া ভাসাইয়া দেয়। এটা যে অন্যায়,—এটা যে দোষের তাহা তাহারা যে না বুঝে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের বাধা দিবার হাত থাকে না কেন? মোহ পাপের মন্দিরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের চোখে যে ভেল্কি লাগাইয়া দেয় তাহা হইতে তাহাদের বাহির হইবার,—পরিত্রাণ পাইবার কোনই উপায় থাকে না।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম আপাততঃ যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিব এই মহৎ-আশ্রমেই বাস করিব। তাহার পর একবার বাটী যাইয়া মাতার অনুমতী লইয়া বাটী ভাড়া করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এখানে বসবাস করিব। মহৎ-আশ্রমে যে ঘরখানা আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল সেখানা যদিও খুব বড় নহে কিন্তু আলো বাতাসের অভাব ছিল না। গৃহের ভিতর অতি সামান্যই আসবাব পত্র, এক পার্শ্বে একখানি ক্যাম্প খাট,—ও অপর পার্শ্বে একটা ড্রেসিং টেবিল। আমি ভৃত্যকে আমার বেডিংটা ক্যাম্পখাটখানার উপর খুলিয়া পাতিয়া দিতে বলিলাম।

সে সমস্ত গৃহটা একবার ভালো করিয়া ঝাট দিয়া বেডিংটা সেই ক্যাম্প খাটের উপর পাতিয়া দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিল। আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "দেখ এক পেয়ালা খুব গরম চা নিয়ে এস দেখি ;—আর অমনি তার সঙ্গে দুটো হাপ-বয়েল ডিমও নিয়ে এস।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া ভৃত্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি সেই ক্যাম্প খাটখানার উপর যাইয়া জুত খুলিয়া বসিলাম। বাটী হইতে যখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন মায়ের নিষেধ বাণীগুলা প্রলোভনের টানে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল তাহার কোন চিহ্নই কোন স্থানে দেখিতে পাই নাই, কিন্তু কলিকাতায় নামিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কথাগুলা ক্রমাগতই প্রাণের ভিতর ভাসিয়া উঠিয়া আমার সমস্ত প্রাণটা যেন কেমন আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিল। কেবল যেন আপনা হইতেই মনে হইতেছিল, মায়ের অবাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসাটা আমার একেবারেই ভাল হয় নাই। দুই এক দিন আরো দেশে থাকিয়া মাতাকে বুঝাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়াই আমার আসা উচিত ছিল। উচিত ছিল বটে কিন্তু এই দুই এক দিন থাকা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছিল। মোহ যে কি ভয়ঙ্কর দ্রব্য তাহা মোহে না পড়িলে বুঝিবার উপায় নাই। মোহেই মানুষ অন্ধ হয়,—জ্ঞানহারা হয়,—

এমন কি শেষ পাগল পর্য্যন্ত হইয়া যায়। তখন পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, সুহৃদ বন্ধুর হিতোপদেশ তীক্ত বিষের মত কর্ণে যেন করতালি বাজায়। কেবলই মনে হয় তাহারা ঠিক আমার অবস্থাটা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহাদের চির দিনের সংস্কার সেই যে বারনারী ভালো হইতে পারে না, সেই সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া যাহা তাহা বাজে বকিয়া যাইতেছে। মন্দের ভিতরও যে ভালো থাকিতে পারে তাহা তাহাদের কেমন করিয়া বুঝাইব? আবার কখন কখন মনে হইত ইহারা আমার প্রেমে হিংসা করিয়া এই সকল কথা বলিতেছে। হায় একদিনের জন্যও তখন মনে হয় নাই যে ইহারা আমারই মঙ্গলের জন্য বলিতেছে, ইহাতে ইহাদের কোনই স্বার্থ নাই।

ভৃত্য এক পেয়ালা চা ও দুইটা অৰ্দ্ধ সিদ্ধ ডিম দিয়া গেল। রাত্রে ট্রেণে ভালো নিদ্রা হয় নাই। চা ও ডিম খাইয়া শরীরটা যেন অনেকটা সুস্থ হইল। তখনই মনে হইল একবার লীলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি কিন্তু আবার ভাবিলাম, এ সময় সেখানে গেলে দুই দণ্ডও স্থির হইয়া বসিতে পারিব না। এখনি আবার আহারের জন্য ফিরিয়া আসিতে হইবে। তাহাপেক্ষা সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া একেবারে যাওয়াই বিধেয়। কাজেই প্রাণের হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও আহারের অপেক্ষায় সে সময়ের জন্য যাওয়া বন্ধ রাখিলাম। কিন্তু এরূপ ভাবে চুপচাপ গৃহের ভিতর একাকী

থাকিতেও ভাল লাগিতেছিল না, সমস্ত প্রাণটা কেমন যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। আমি ঘরের ভিতর কয়েকবার পায়চারি করিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানি চিঠি লিখিবার কাগজ ও খাম বাহির করিলাম, ও নায়েব মহাশয়ের নামে দেশে আমার কলিকাতায় নিরাপদে পৌঁছান সংবাদটা জ্ঞাপন করিয়া একখানা পত্র লিখিয়া দিলাম। তাহাতে তাঁহাকে লিখিলাম,—বিশেষ একটা জরুরী কাজ থাকায় বাধ্য হইয়া আমাকে গত কল্য রাত্রে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইয়াছে। আমি আপাততঃ মহৎ-আশ্রমে আসিয়া উঠিয়াছি,—যদি কোন প্রয়োজন হয় আমাকে এই ঠিকানায় পত্র দিবেন। মাকে বলিবেন তিনি যেন আমার জন্য চিন্তা না করেন, আমি দুই এক দিনের মধ্যেই এখানকার কাজ শেষ করিয়া বাটী ফিরিয়া যাইব।

পত্রখানা খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া তখনই ভৃত্যকে ডাকিয়া ডাকে দিতে বলিলাম। ভৃত্য পত্রখানা ডাকে ফেলিবার জন্য চলিয়া গেল। প্রত্যূষে আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি তাহার পর এত কাজ করিলাম তথাপি সময় কাটিতে চাহিতেছিল না,—বেলা আর যেন কিছুতেই বাড়িতেছিল না। মহৎ-আশ্রমে উঠিবার পর তিন চারি ঘণ্টা যে আমি কি কষ্টে কাটাইলাম তাহা ভগবান বলিতে পারেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, “স্নানের ঘরে জল দেওয়া হয়েছে,—স্নান কর্ব্বেন কি?”

সারা রাত্রি ট্রেনে জাগিয়া আসিয়াছি, স্নান না করিলেই নয়। আমি ভৃত্যের কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বলিলাম, "স্নান কর্ব্বো বৈ কি। স্নানের ঘরে জল দেওয়া হয়েছে?"

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

আমি ভৃত্যকে আর কোন কথা না বলিয়া ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে সুবাসিত তৈলের শিশিটা বাহির করিয়া,—মস্তকে যৎ সামান্য একটু তৈল প্রদান করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। পাচক আমার গৃহে ভাত দিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া ফেলিলাম। আহার শেষ করিয়া উঠিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিল। আর আমার দেরী করা কিছুতেই উচিত নয়। আমি বেশটা তখনি পরিবর্ত্তন করিয়া নিজেকে একটু চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করিয়া লইয়া মহৎ-আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বৈশাখ মাস রৌদ্রে সমস্ত কলিকাতা সহর পুড়িয়া যাইবার মত হইতেছে। এ রৌদ্রে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আর কেহ বাটী হইতে বাহির হইতে চায় না। রাজ পথে লোক চলাচল অতি অল্প। আমি মহৎ-আশ্রম হইতে বাহির হইয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী লীলাদের বাড়ীর দিকে ছুটিল। আজ এক মাস লীলার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই,—আজ এই এক মাস তাহাকে একবারের জন্যও দেখিতে না পাইয়া যে কষ্ট অনুভব করিয়াছি,—তাহা কেবল

অন্তর্য্যামী জানেন। গাড়ী যতই লীলাদের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমার প্রাণটা আপনা হইতেই ততই যেন স্পন্দিত হইতে লাগিল। আজ একমাস পরে লীলাদের বাটী যাইতেছি,—সে কি বলিবে না বলিবে,—সে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে গ্রহণ করিবে কি না করিবে এইরূপ নানা প্রশ্ন নানা দিক দিয়া আসিয়া আমার সমস্ত প্রাণটা অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। গাড়ী আসিয়া লীলাদের বাটীর দরজায় দাঁড়াইল। আমি স্পন্দিত হৃদয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ওয়ানকে বার আনা পয়সা দিলাম। গাড়ওয়ান ভাড়া পাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতে ছিলাম সেই সময় সহসা আমার দৃষ্টি রাস্তার উপরিস্থিত বারান্দার উপর পতিত হইল। দেখিলাম বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া লীলা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাকে বারান্দার উপর দেখিবামাত্র আমার প্রাণের চাঞ্চল্যতাটা অনেকটা কমিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ স্পন্দনও বন্ধ হইল। আমাকে বারান্দার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে বেশ একটু টিট্‌কারী দিয়া বলিয়া উঠিল, "তবু ভালো যে মনে পড়েছে,—ওপরে এস।"

আমি লীলার কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমার মনে হইল আমার প্রাণের সমস্ত অন্ধকারটা যেন নিমেষে চন্দ্রমা উদয়ে একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি উপরে উঠিয়া দেখিলাম লীলা তাহার

গৃহের সম্মুখের বারান্দা উপর রেলিং ধরিয়া আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে সেই হাসি,—সে হাসি আজও আমি ভুলিতে পারি নাই,—যে হাসি দেখিয়া আমি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া মরিচিকা ধরিতে ছুটিয়া ছিলাম। আমি উপরে উঠিবামাত্র লীলা ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল,—ও টানিতে টানিতে একেবারে আমাকে তাহার গৃহের ভিতর লইয়া গেল। আমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লীলার মাতা মেজের উপর একখানা কম্বল বিছাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। আমি ধীরে ধীরে যাইয়া ফরাশের উপর উপবিষ্ট হইলাম। লীলা আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের খবর সব ভাল তো? মা ভাল আছেন?"

আমার কথায় লীলা একেবারে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল;—তাহার হাসিতে আমি যেন কেমন অপস্তুত হইয়া পড়িলাম,—মৃদু স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাস্‌ছ যে?"

লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাসবো না। তোমার যেমন কথার শ্রী। মাতো তোমার সম্মুখেই শুয়ে আছে আর জিজ্ঞাসা কচ্চ কি না মা ভালো আছেতো?"

লীলার হাসির খিলখিল শব্দে লীলার মাতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—সে আমাকে গৃহের ভিতর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া,—তাড়াতাড়ি তাহার অসংযত বস্ত্র একটু সংযত করিয়া লইয়া মাথার

উপর ঈষৎ একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া কন্যার দিকে চাহিয়া বলিল,—"বেটী যেন ঢং।"

মায়ের কথায় লীলা আরও হাসিতে লাগিল,—লীলার মাতা তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তারপর বাবা বাড়ীর সব ভালো,—মা ভালো আছেন। কাকার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল।"

আমি মুখে কোন উত্তর দিলাম না,—একবার একটু মৃদু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সব কয়টা কথার উত্তর সারিলাম। লীলার মাতা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আবার বলিল, "তুমি বাবা একমাস আসনি এ বেটীকে নিয়ে যে কি জ্বালায় পড়েছিলুম। বেটী খাবে না শুবে না সে এক ফ্যাসাদ। বাবা সত্যিই মেয়েটা তোমায় বড্ড ভালবাসে।"

মেয়েটা তোমায় বড্ড ভালবাসে এই কয়টী কথা আমার কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া আমার সমস্ত বুকটা একেবারে তোলপাড় করিয়া দিল। লীলা আমায় ভালবাসে ইহা অপেক্ষা আর আমার কি সৌভাগ্য হইতে পারে! আমার সমস্ত প্রাণটা যেন একটা নূতন আবেশে রাঙ্গিয়া উঠিল। আমি মুখ তুলিয়া লীলার মাতার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না,—আমার কণ্ঠ হইতেও কোন কথা বাহির হইল না;—আমি মস্তক অবনত করিলাম। লীলা কৃত্রিম ক্রোধের সহিত মায়ের দিকে চাহিয়া

ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া বলিল, "যাও মা,—তোমার যেমন কথা। কবে আমি আবার খাইনি,—ঘুমুইনি।"

লীলার কথায় লীলার মাতার মুখে কেমন যেন একটা বিদ্রুপের হাসি ভাসিয়া উঠিল,—সে হেলিতে দুলিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিল, "ওরে কাশী কোথায় গেলিরে,—বাবার যে জল খাবার এনে দিতে হবে।"

তাহার পর পদ শব্দে বুঝিলাম লীলার মাতা নীচে নামিয়া গেল। লীলা আমার পার্শ্বে মুখখানা ভার করিয়া বসিয়া ছিল,—আমি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "বা আমার ওপর রাগ করে মুখ ভার কল্লে কি হবে! তুমি আমার জন্যে খাওনি ঘুমুওনি তা আমি জেনে ফেলেছি এতে আর এত লজ্জা কিসের?"

লীলা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "হাঁ,—ও মিথ্যে কথা,—আমার বয়ে গেছে।"

একমাস বাদে লীলার বাটী গিয়াছি,—আজ লীলাকে দেখিয়া,— কথা কহিয়া যেন আমার আশ মিটিতেছিল না। কথায় কথায় কত কথাই হইল, সে কথার অন্ত নাই—শেষ নাই। সে দিন আর মহৎ-আশ্রমে ফিরা হইল না,—সেইখানেই রাত্রের আহার শেষ হইল,—রাত্রিও কাটিয়া গেল। তাহার পর হইতে আবার আমার লীলাদের বাটী পূর্ব্বের ন্যায় যাতায়াত আরম্ভ হইল। প্রত্যূষে আহারের জন্য নাম মাত্র একবার করিয়া মহৎ-আশ্রমে

আসিতাম, বাকি সব সময়ই আমার লীলাদের বাটীতে কাটিতে লাগিল।

এই ভাবে এক সপ্তাহ কটিবার পর বাটী হইতে নায়েব মহাশয়ের এক পত্র পাইলাম,—তিনি লিখিয়াছেন,—"আপনার মাতাঠাকুরাণী আপনার এখান হইতে চলিয়া যাইবার পরই কাশী চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার দিন তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আর দেশে ফিরিবেন না। আপনি যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান তবে কাশী যাইবেন। তাঁহার ঠিকানা নিম্নে লিখিয়া দিলাম। সম্প্রতি আপনার একবার দেশে আসিবার বিশেষ প্রয়োজন। বাটীর জিনিষ পত্র সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া রহিয়াছে। আপনি একবার আসিয়া সেগুলির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া যাইলে ভালো হয়।"

মা কাশী চলিয়া গিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মনটা যেন কেমন আপনা হইতেই খারাপ হইয়া পড়িল,—মায়ের উপর একটু যে রাগ হইল না তাহাও নহে। আমি তখনি নায়েব মহাশয়ের পত্রের উত্তর দিলাম, আপাততঃ আমার যাইবার একেবারেই ফুরসুদ নাই। আমি আপনার উপর সমস্ত ভার দিলাম। আপনি যেরূপ ভালো বিবেচনা করিবেন সেইরূপ করিবেন। তখনই পত্র ডাকে চলিয়া গেল,—আমিও যেন নিশ্চিন্ত হইলাম। মায়ের বিনা অনুমতিতে বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম,—সেইজন্য

প্রলোভন।

প্রাণটা মাঝে মাঝেই আনচান করিয়া উঠিত। প্রায়ই ভাবিতাম একবার বাটী যাইয়া মায়ের অনুমতি লইয়া আসি। কিন্তু মায়ের কাশী গমনের সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে আন্‌চানানিও ঘুচিয়া গেল। হায় তখন তো বুঝি নাই সংসার ও সমাজ এমনি করিয়া ঘৃণায় আমায় দূরে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। আমি ভাবিলাম আমি নিশ্চিন্ত হইলাম,—এইবার লীলার প্রেমে একেবারে ডুবিয়া থাকিতে পারিব। মোহের কজ্জল নয়নে লেপিলে মানুষ এমনিই অন্ধ হইয়া পড়ে। প্রলোভন চক্রে পড়িলে মানুষের ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা একেবারে চির দিনের মত লুপ্ত হইয়া যায়।

নবম পরিচ্ছেদ

আজ ঠিক এক বৎসর হইল, জননী কাশী চলিয়া গিয়াছেন; পুত্রের আচরণে তিনি যে ব্যথা পাইয়াছিলেন,—সে ব্যথায় বোধ হয় তাঁহার বক্ষ ভাঙ্গিয়া গিয়া ছিল,—সংসারের উপর তাহার আর কোন শ্রদ্ধা ছিল না,—তিনি সেই যে আমার উপর অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার পর তিনি আমাকে একখানি পত্র পর্য্যন্তও দেন নাই। তাহাতে আমার তাঁহার উপর আরও ক্রোধ বাড়িয়া গিয়াছিল। আমিও আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়াও তাহার খোঁজ করি নাই। এই এক বৎসরের মধ্যে আমি এক দিনের জন্যও দেশে যাই নাই,—নায়েব মহাশয় আমার খরচ মাসে মাসে মনি অর্ডার যোগে প্রেরণ করিতেন। তাহার নিকট হইতে মাঝে মাঝে পত্র পাইতাম,—তাহাতে দেশের নানা সংবাদ পাইতাম কিন্তু জননীর কোনই খবর পাইতাম না। হয়তো নায়েব মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, আমি মায়ের পত্র নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। তাঁহার সংবাদ আমাকে লেখা বাহুল্য। আমাদের যিনি নায়েব ছিলেন,—তিনি অতি প্রাচীন লোক। আমার পিতার আমল হইতেই তিনি আমাদের নায়েবীগিরি করিতেছেন। তিনি সত্যই নেমকের কদর বুঝিয়াছিলেন,—আমার এই অবিদ্যমানতায়ও তিনি বুক দিয়া

আমাদের সম্পত্তি রক্ষা করিতে ছিলেন। তাহার ন্যায় সদলোক নায়েব না থাকিয়া যদি সে সময় সেই পদে কেহ ফন্দিবাজ থাকিত তাহা হইলে সে অনায়াসেই আমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি হইতে প্রতারিত করিতে পারিত,—আমি পথের ভিখারী হইতাম। কারণ আমি বেশ জানি তখন যদি সংবাদ পাইতাম যে আমার সম্পত্তি লাটে উঠিয়াছে তথাপি আমি এক দিনের জন্যও দেশে যাইতাম না। যেটুকু সময় মহৎ-আশ্রমে থাকিতাম কেবল সেই সময়টুকুর জন্য এক একবার মায়ের জন্য মনটা কেমন আন্‌চান্‌ করিয়া উঠিত,—তিনি কেমন আছেন সেই সংবাদটুকু জানিবার জন্য প্রাণটা যেন কেমন আকুল হইয়া পড়িত,—কিন্তু লীলার বাড়ী উপস্থিত হইবা মাত্রই আর কোন কথাই মনে পড়িত না,—রূপ মোহে বিভোর হইয়া পৃথিবী ভুলিয়া থাকিতাম। অশুদ্ধ প্রণয়ের বেগ যে কি ভয়ঙ্কর তাহা মুখে ব্যক্ত হয় না। ইহার টানে পড়িলে কোন বাধই মানুষকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। দয়া, মায়া, ভক্তি প্রীতি, স্নেহ, মমতা যে কোথায় ভাসিয়া যায় তাহার কোনই পাত্তা পাওয়া যায় না।

দুই বৎসর মোহের ভিতর দিন রাত্রি বসবাস করিয়া আমার এইটুকু জ্ঞান হইয়াছে যে, রূপমোহ যাহারা অর্থ দিয়া খরিদ করে, তাহাদের ঠিক প্রলোভনের প্রচণ্ড বেগটা সহ্য করিতে হয় না। তাহারা প্রলোভনের ভিতর দিয়া কেবল উপর উপর ভাসিয়া যায়,—

কিন্তু যাহাদের অর্থ লাগে না, তাহাদেরই সর্ব্বনাশ। এই মোহচক্র হইতে বাহির হইবার তাহাদের আর কোন পথই থাকে না। পাপ তাহাদের এরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরে যে, তাহারা অচিরাৎ পাপের নিয়ত স্পর্শে এক একটা প্রকাণ্ড পাপী হইয়া দাঁড়ায়। নীচতায় তাহাদের সমস্ত হৃদয়টা একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাদের প্রাণের ভিতর কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, এইটাই তাহাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। হায়! তখন আমিও ঠিক ওই কথাই ভাবিয়া ছিলাম যে, যখন এই বালিকা আমাকে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—তখন এ যাহাতে সুখে থাকে ও যাহাতে অনাহারে না মরে, এ যাহাতে পাপের পঙ্কিলতার ভিতর একেবারে ডুবিয়া না যায় তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করাই আমার জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তখন একবারও মনে হয় নাই যে, এস্থানে কর্ত্তব্য করার অর্থই,— কর্ত্তব্যের অবমাননা। তাহা কর্ত্তব্য করা নহে, তাহা নিজের সর্ব্বনাস করা। লীলার সহিত আমার যে দিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, লীলাদের বাটী আমি যে দিন প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন লীলার বয়স আন্দাজ বার বৎসর। আজ দুই বৎসর আমি প্রতিদিন লীলার বাটীতে আসিতেছি, কাজেই লীলার বয়স এক্ষণে চোদ্দ বৎসর। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবন সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছে। যোল কলা পরিপূর্ণ যৌবনে তাহার সমস্ত দেহটা যেন একেবারে ঢলঢল করিতেছে। তাহার রূপ যেন ফাটিয়া

পড়িতেছে। সেই রূপ সমুদ্রে আমি অন্ধ হইয়া ডুবিয়া ছিলাম সহসা সেই সমুদ্রের একটা ভীষণ তরঙ্গে আমাকে একেবারে প্রলোভন হইতে দূরে,—বহুদূরে যেন কিনারার উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল। সেই এক আছাড়েই আমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে গুড়াগুড়া হইয়া গেল। সে প্রাণটা আজও জোড়া দিতে পারিলাম না। সেই হইতে গাঢ় অন্ধকার হৃদয়ের ভিতর পুরিয়া নিরাশয় ভিতর দিয়া জীবনটা কোন ক্রমে কাটাইয়া দিতেছি। কুএর সহিত বসবাসে প্রাণের সমস্ত তার একেবারে বেসুরা হইয়া গিয়াছে। উড়ো টপ্পার বাধা বোলে সাধা তারে কি কোন দিন রাগ রাগিনী বাজিতে পারে? বাজাইবার চেষ্টা করিলেই যে তার ছিঁড়িয়া যাইবে। প্রাণের আবেগে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, আর থাক এইবার আসল ঘটনাটা কি বলি।

একদিন সন্ধার সময় লীলার বাটীর দ্বারে আসিয়া দেখিলাম এক খানি অতি সুন্দর জুড়ী তাহাদের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জুড়ীর অশ্বদ্বয় ও সাজসজ্জা মালিক যে অর্থশালী তাহার প্রচুর পরিচয় চারিদিকে জ্ঞাপন করিতেছে। আমি ইতি পূর্ব্বে আর কখনও তাহাদের দ্বারে ওরূপ জুড়ী দাঁড়াইতে দেখি নাই। আজ সহসা তাহাদের দ্বারে এই জুড়ী দেখিয়া যে শুধু বিস্মিত হইলাম তাহা নহে,—সমস্ত প্রাণের ভিতরটা যেন কেমন আপনা হইতেই কাঁপিয়া উঠিল। আমি ধীরে ধীরে লীলাদের বাটীর ভিতর

প্রবেশ করিলাম। অন্য দিন লীলা আমার অপেক্ষায় বারান্দার উপরে গৃহের দরজার ধারটীতে দাঁড়াইয়া থাকে,—আজ তথায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই আমার প্রাণে আজ যেন কেমন আপনা হইতেই কু গাহিতেছিল তাহাকে বারান্দায় না দেখিয়া আমার প্রাণটা যেন একেবারে প্রাণের ভিতর বসিয়া গেল। ভাবিবার বা চিন্তা করিবার আমি আর অবসর পাইলাম না। তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া লীলার গৃহের দিকে যাইতেছিলাম, সহসা সম্মুখের গৃহ হইতে লীলার মাতার একটা কথা কর্ণে প্রবেশ করায় আমি থম্‌কাইয়া সেই খানেই দাঁড়াইলাম। লীলার মাতা কাহার সহিত কথা কহিতেছে? এরূপ কাতর ভাবে তাহাকে কথা কহিতে পূর্ব্বে আর আমি কখন শুনি নাই। আমি সেই গৃহের সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইয়াছিলাম। গৃহের ভিতর যে সকল কথা হইতেছিল, সব কথাগুলি আমার কর্ণে স্পষ্ট আসিতেছিল না। যে কয়টা কথা শুনিলাম তাহাতেই আমার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী আমার পদতলে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল,—আমি আর একটু হইলেই হয়তো ভূপতিত হইতাম, সবলে বারান্দার রেলিং চাপিয়া ধরিলাম। একজন পুরুষের মোটা কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে আসিল, "তোমার মেয়ে বড় বেয়াড়া, ওকে বেশ কড়া রকম শাসন করা প্রয়োজন।"

লীলার মাতা অতি কাতর কণ্ঠে উত্তর দিল, "সে আপনাকে বল্‌তে হবে না। একটা ছোড়ার পাল্লায় প'ড়ে একেবারে ব'য়ে যেতে বসেছে। আজ আমায় মাপ করুন,—কিছু মনে কর্‌বেন না। আপনি কষ্ট ক'রে একবার কা'ল এমনি সময় আস্‌বেন,—কা'ল আর আপনাকে ফির্‌তে হবে না।"

আবার সেই পুরুষের কণ্ঠস্বর কর্ণে আসিল, "না—না, আমি কিছু মনে করিনি,—আমি কা'ল ঠিক এমনি সময় আবার আসবো। দেখ যেন ফির্‌তে না হয়। তুমি না হয় এই একশো টাকা বায়না রেখে দাও।"

গৃহের ভিতর লীলার মাতার সহিত পুরুষটার কি কথা হইতেছিল তাহা বুঝিবার আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। আমি আর দাড়াইতে পারিলাম না,—ছুটিয়া লীলার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গৃহে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে,—ফরাশের এক কোনে একটা তাকিয়ার ভিতর মুখ গুজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া লীলা ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার নিকট উপস্থিত হইতে আমার পা কাঁপিতে লাগিল,—আমি স্পন্দিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে লীলার নিকটে যাইয়া উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লীলা—লীলা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?"

লীলা আমার কথার কোন উত্তর দিল না, আরও ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিতেও আমার সাহসে কুলাইল না। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিহ্বলভাবে তাহার পার্শ্বে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া একটী ভদ্রলোককে নীচে নামিয়া যাইতে দেখিলাম। লোকটার বয়স যে বিলক্ষণ হইয়াছে তাহা তাহার মস্তকের অর্দ্ধেকের উপর পাকা চুল সাক্ষ্য দিতেছে। লোকটা যেমন স্থূল,—তেমনি কৃষ্ণবর্ণ। শুধু তাহার ভুঁড়িটাই বোধ হয় আড়াই মন ওজনে হইবে। এই লোকটাই যে এতক্ষণ লীলার মাতার সহিত সম্মুখের গৃহে কথা কহিতেছিল তাহা আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষোভে আমি একেবারে মরমে মরিয়া গেলাম। আমার মনে হইল লোকটাকে ধরিয়া এখনি উত্তম মধ্যম দিয়া দিই ;—কিন্তু আমার বোধ হয় পূর্ব্ব পুরুষের অনেক পুণ্য ছিল,—আমি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিলাম। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল এই লোকটার চরিত্র কি কলুষিত। মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে তথাপি এখনও লালসার নিবৃত্তি নাই। এই নিরীহ বালিকার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা বৃষ্টি করিতেছে। ইহাতে কি ইহার একটু লজ্জা বোধও হয় না ;—ঘৃণা হয় না।হায় ! তখন সেই লোকটাকেই শত ধিক্কার দিতেছিলাম,— কিন্তু আমি মোহে এমনি অন্ধ হইয়াছিলাম যে নিজের দিকে একবারও চাহিয়া দেখিতেছিলাম না। তখন একবারও মনে হয় নাই যে

আমিও তাহারই দলভুক্ত একজন। আমিও যে জননী, সমাজ, সংসার ত্যাগ করিয়া এই নরকে ডুবিয়া চরিত্রটাকে একেবারে কলুষিত করিয়া ফেলিতেছি। আমাকেও যে সহস্র ধিক্। আমি ভাবিবারও অধিক সময় পাইলাম না, সেই লোকটা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই লীলারমাতা ঝড়ের মত আসিয়া আলুথালু বেশে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। এরূপ পৈশাচিক ভাবাপন্ন নারীমূর্ত্তি জীবনে আর আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সেই দানবীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কেমন যেন একটা আতঙ্কে আমার সর্ব্ব শরীর থরথর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। লীলারমাতা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা পৈশাচিক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হ্যাঁলা তোর যে বড় বুদ্ধি বেড়েছে,—ভদ্রলোকের অপমান করা,—আজ দেখি তোর কোন বাবা রক্ষে করে।"

লীলার মাতার দৃষ্টি এতক্ষণে আমার উপর পতিত হইল। ফরাশের উপর লীলার পার্শ্বে আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার সেই পৈশাচিক মূর্ত্তি আরও যেন বিকট হইয়া উঠিল, সে আমার দিকে ফিরিয়া ফুলিতে ফুলিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি যদি বাপু ভদ্রলোকের ছেলে হও তবে খবরদার আর আমাদের বাড়ী ঢুকো না।"

তাহার পর আবার কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিল, "যত কিছু

বলি না তত বাড় বেড়ে উঠেছে,—না ? যদি ঝেটিয়ে না তোর পিরীত বা'র করি তবে আমার নাম খুদি বাড়ীওয়ালী নয়। ও বেটী আমার সতী হয়েছে।"

ক্রোধে তাহার কণ্ঠ আবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল,—সে তাহার সেই বিকৃত মুখে নানারূপ অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। লীলারমার এই পৈশাচিক আচরণে ও অশ্রাব্য গালাগালি শুনিয়া আমার আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকিতে ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু লীলার সেই অশ্রুপরিপূর্ণ কাতর মুখখানির প্রতি চাহিয়া আমার মন আর কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। নীরবে অবনত মস্তকে আমি পাষাণের মত সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। তখনও সম্মুখের গৃহ হইতে অকথ্য ভাষায় অজস্র গালাগালি আমার কর্ণের ভিতর করতালি বাজাইতে লাগিল। আমার বোধ হয় বাহ্য চৈতন্য ছিল না কারণ আমার যখন চমক ভাঙ্গিল,—তখন রাত্রি গভীর—সমস্ত জগৎ সুষুপ্তির কোলে নিমগ্ন। আমার পার্শ্বে লীলা উপবিষ্ট। আমাকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি আর এখানে থাক্‌বো না,—আমাকে এখনি এখান থেকে তুমি নিয়ে চল।"

লীলার কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর কে যেন এক কলস সুধা ঢালিয়া দিল। তাহা হইলে কি সত্যই লীলা আমাকে ভালবাসে ? সে যখন আমার জন্য তাহার মাতাকেও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত,

তখন তো আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। লীলার মাতার সমস্ত অপমান,—সমস্ত গালাগালি লীলার এই এক কথায় যেন আমার হৃদয় হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল তখনই লীলাকে সেই নরক হইতে লইয়া যাই,—কিন্তু এই রাত্রে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইব? পূর্ব্বের মত এখানে যদি আমার বাসা থাকিত তাহা হইলে চিন্তার কিছুই ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তো আর তাহা নাই। আমি এক্ষণে মহৎ-আশ্রমে বাস করিতেছি। সেখানে তো লীলাকে তুলিতে পারি না! আমার মাথার ভিতর সহস্র চিন্তা সহস্র ভাবে আসিয়া হু হু শব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া লীলার কথার উত্তরে চিন্তিত স্বরে বলিলাম, "কাল সকালেই আমি তোমায় নিয়ে যাব। তোমায় তো সবই বলেছি, তুমি তো সবই জান, এখন আমি মহৎ-আশ্রমে আছি। সেখানে তো তোমায় নিয়ে যেতে পারিনি। কা'ল সকালেই যেমন ক'রে হো'ক,—আমি একখানা বাড়ী ঠিক ক'রে ফেলবো। তুমি ঠিক হ'য়ে থেকো।"

আমার কথায় লীলার চোখ দুইটী ছলছল্ হইয়া উঠিল,—সে আমার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কা'ল কি তুমি আর আমাকে নিয়ে যেতে পার্ব্বে? কা'ল বোধ হয় আমার আর যাওয়া হবে না।"

লীলার কথায় আমার সমস্ত প্রাণটা চন্‌মন করিয়া উঠিল,—আমি মহা বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন—কেন ?"

লীলা আবার একটা কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টিটুকুর ভিতর দিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম সে যেন কি একটা কথা আমার নিকট গোপন করিল। সে অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "সেই ভালো,—আমি ঠিক হয়ে থাক্‌বো। কাল তুমি কিন্তু নিশ্চয়ই আমায় নিয়ে যেও।"

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, ভোরের বাতাস গবাক্ষের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া গৃহের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি চিন্তার একটা প্রকাণ্ড বোঝা মস্তকে তুলিয়া লইয়া একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে দিনকার মত লীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে তাহাদের বাটী হইতে বাহির হইলাম। রাত্রি আর বেশী ছিল না,—প্রত্যুষ হইবার অপেক্ষায় আমি ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে চলিলাম। গঙ্গার ধারে যাইয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করিতেই উষার আলো ফুটিয়া উঠিল। আমি একখানি বাটী ভাড়া করিবার জন্য তখনি তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সমস্ত কলিকাতা তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া বহু কষ্টে আমি একখানা বাড়ী ভাড়া করিতে সক্ষম হইলাম। বাড়ীটার চাবী হস্তগত করিয়াই আমি লীলাকে সেই নরক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের বাটীর দিকে ছুটিলাম। আমি

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিলাম,—উঠানের মাঝখানেই আমার সহিত লীলার মাতার সাক্ষাৎ হইল,—সে আমাকে উপরে যাইতে দেখিয়া, বাধা দিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ,—নেড়ীর সঙ্গে দেখা হবে না।"

তাহার কথায় আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম,—বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

লীলার মাতা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুমি কেমন ধারা ভদ্রলোকের ছেলে গা,—তোমায় না কাল আমাদের বাড়ীতে ঢুক্‌তে বারণ করে দিইছি। অপমান না হ'লে বুঝি আর হায়া হবে না।"

আমার হৃদয়ে তখন তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল,—মান অপমান জ্ঞান তখন আর আমার মোটেই ছিল না। আমি কাতর কণ্ঠে বলিলাম, "আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে যাব,—আমি আপনার পায়ে ধচ্ছি আমাকে একবার তার সঙ্গে দেখা কত্তে দিন।"

লীলার মাতা তাহার দক্ষিণ হস্তখানা আমার মুখের সম্মুখে নাড়িয়া মুখখানা আরও বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আর অত সোহাগে কাজ নেই,—ভালোয় ভালোয় বিদেয় হও,—নইলে চাকর দিয়ে বিদেয় করে দেব।"

আমি কাহার পুত্র,—আমার বংশের অত বড় মান আমি সকলি ভুলিলাম,—আমি সেই উঠানের মাঝখানে দুই হস্তে সেই ঘৃণিত বার-নারীর পা দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া কাতরে বলিলাম, "আমি আপনার পায়ে ধর্‌ছি আমায় জন্মের মত একবার তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে দিন।"

লীলার মাতা জোর করিয়া তাহার পদদ্বয় ছাড়াইয়া লইয়া একেবারে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ কোথাকার আপদ গো এখানে মর্ত্তে এসেছে। দুশোবার বল্‌ছি দেখা হবে না,—তবু দ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর। বেরোও বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে,—"

লীলার মাতার এই বিকট চীৎকারে তাহার দরজার নিকট যে দুই চারিজন হিন্দুস্থানী বৃন্দাবনী চাদর গায়ে বসিয়াছিল,—তাহারা আসিয়া সেই উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইল। তাহার ভিতর হইতে এক ব্যক্তি সটান আমার হাতখানা ধরিয়া বলিল, "বাবু,—এ সকাল বেলা এখানে এসে কেন ঝুটুমুটু গোলমাল কচ্ছেন। বাড়ী যান—বাড়ী যান,—আপনারা ভদ্রলোক—আপনাদের কত বড় ইজ্জৎ—"

সে ব্যক্তি আমাকে কোন কথা বলিবারও অবসর দিল না,—আমার হাত ধরিয়া একরূপ জোর করিয়াই বাটীর বাহির করিয়া দিল। আমরা বাটী হইতে বাহির হইবা মাত্র লীলার মাতা সদর দরজার অর্গল আটিয়া দিল। আমি বিহ্বলের মত সেই দরজার

সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি বহুক্ষণ তথায় সেইভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম,—কিন্তু কেহই আর দরজার অর্গল খুলিল না;—বাটী হইতেও কেহ আর বাহির হইল না। আমি অনাহারে সমস্ত দিন সেই বাটীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম,—আশা যদি একবার লীলার সহিত সাক্ষাৎ হয় কিন্তু দিনের পর রাত্রি আসিল, সমস্ত পাড়াটা আবার জাগিয়া উঠিয়া মাতামাতি আরম্ভ করিল, কিন্তু তথাপি লীলাকে একবারের জন্যও আমি দেখিতে পাইলাম না। বহু রাত্রে হতাশ হৃদয়ে একরাশ অন্ধকার প্রাণের ভিতর পুরিয়া লইয়া মহৎ-আশ্রমে ফিরিলাম। রাত্রে আহারও মুখে কিছু রুচিল না,—নিদ্রাও আসিল না। আমি বিছানায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম।

এক মাস কাল দিন রাত্রি লীলাদের বাটীর চারি পার্শ্বে পাগলের মত ঘুরিয়াও একদিনের জন্যও লীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। আমি বেশ বুঝিতেছিলাম এরূপ ভাবে আর অধিক দিন কলিকাতায় থাকিলে আমি সত্যই পাগল হইয়া যাইব। কলিকাতা আমার নিকট একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি আমার এই প্রাণের জ্বালায় একটু শান্তি পাইবার জন্য শেষ জননীর নিকট কাশীতে ছুটিলাম।

হতাশ প্রেমের যে কত জ্বালা তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না,—তাহাতে প্রাণের প্রতি কজা আল্‌গা হইয়া খসিয়া পড়ে।

সে আঘাতে একবার প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেলে আমার বিশ্বাস তাহা আর জীবনে কোনদিন জোড়া লাগে না। আর কেমন করিয়াই বা জোড়া দেওয়া যাইবে। মৃত্তিকা কলসী যতদিন কাঁচা থাকে ততদিন তাহা শতবার ভাঙ্গিলে শতবার জোড়া যায়,—কিন্তু একবার পোড়ান থাইলে তাহা আর শত চেষ্টাতেও জোড়া দেওয়া যায় না।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রথম যৌবন যাহার পরশে সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল,—প্রেমের ফুল যাহার পরশে আপনি ফুটিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল,—তাহাকে এমন করিয়া হারাইলে মানুষ কি স্থির থাকিতে পারে? সেই যে আমার প্রাণে হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে এ জীবনে তাহা আর শেষ হইল না। সেই যে হৃদয় শূন্য হইয়া গিয়াছে,—তাহার পর আজ প্রায় কুড়ি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এখনও সেই শূন্যই রহিয়াছে। সেইদিন লীলার মাতা আমাকে তাহাদের বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়া ভাল করিয়াছিল কি মন্দ করিয়াছিল তাহার যদিও এখন পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে পারি নাই, তবে সেই পাপপুরীর ভিতর হইতে লীলাকে যে উদ্ধার করিতে পারিলাম না এইটাই আমার তখন হৃদয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আক্ষেপ হইয়া দাড়ায়াছিল। তাহাতে আমি হৃদয়ে যে ব্যথা পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমার সমস্ত হৃদয়টা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। কত চেষ্টা করিয়াছি তবুও এ ভাঙ্গা প্রাণ আজও জোড়া দিতে পারিলাম না।

আমি কাশীতে আসিলাম,—পবিত্র তীর্থ কাশীর স্নিগ্ধ সমীরণ আমার অঙ্গে বিষের মত ঠেকিতে লাগিল। সে স্নিগ্ধ সমীরণে আমাব প্রাণের জ্বালা একটুও শীতল হইল না,—বরং আরও যেন

বাড়িয়া গেল। কাশীতে মা যেখানে বাস করিতেছিলেন তাহার ঠিকানাটা আমার জানা ছিল। গাড়ী আসিয়া সেই বাটীর সম্মুখে যখন দাঁড়াইল তখন আমার বুকের ভিতরটা এমনি ঢিপ্‌ঢিপ করিতে লাগিল যে আমার দম্‌ বন্ধ হইবার মত হইল। আমি পাগলের মত টলিতে টলিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই,—উমাচরণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। উমাচরণ আমাদের বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। সে যে মায়ের সহিত কাশীতে আসিয়াছে,—নায়েব মহাশয়ের পত্রে পূর্ব্বেই তাহা আমি জানিয়াছিলাম। উমাচরণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন কেমন ভীত হইয়া পড়িল,—সে চিন্তিত স্বরে বলিল, "ছোটবাবুর কি কোন অসুখ বিসুখ করেছে?"

উমাচরণের মুখ চোখের ভাব দেখিয়া আমি বুঝিলাম এই দেহটার এমন কোন একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—যাহা দেখিয়া সে সত্যই ভীত হইয়া পড়িয়াছে। আমার দেহের যে এই একমাসের ভিতর চোখ মুখ বসিয়া অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা যে আমিও মনে মনে না বুঝিতেছিলাম এরূপ নহে, তথাপি আমি উমাচরণের প্রশ্নের উত্তরে কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়া বলিলাম, "ব্যায়ারাম হবে কেনরে,—আমার তো কিছুই হয়নি।"

আমার কণ্ঠস্বর যখন বাহির হয় তখন বোধ হয় তাহা কাঁপিয়াছিল,—নতুবা আমি নীরব হইবামাত্রই উমাচরণ জিজ্ঞাসা করিবে

কেন, "কিন্তু ছোটবাবু আপনার মুখ চোখের চেহারা একেবারেই ভাল নয়,—গলার স্বরটাও যেন কেমন বসা বসা বলে বোধ হয়।"

আমি সে কথাটা চাপা দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উমাচরণ,—মা কোথায়, তিনি কি ওপরে?"

উমাচরণ উত্তর দিল, "আজ্ঞে না,—তিনি গঙ্গাস্নানে গেছেন, এলেন ব'লে। চলুন আপনি ওপরে ব'স্‌বেন।"

উমাচরণ উপরের গৃহ খুলিয়া দিবার জন্য আমার আগে আগে উপরে চলিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া উপরে গিয়া উঠিলাম। উমাচরণ উপরের গৃহ খুলিয়া দিল, গৃহে বিশেষ কোন আসবাব নাই,—কেবল মেঝের উপর একখানা মাদুর পাতা। আমার আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না,—সমস্ত শরীর একেবারে থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি টলিতে টলিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই মাদুরের উপর বসিয়া পড়িলাম। উমাচরণ বলিল, "আপনি ততক্ষণ একটু বসুন,—আমি মাকে খবর দিইগে যে, আপনি এসেছেন।"

উমাচরণ দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, আমি সেই মেঝের উপর মাদুরে বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল,—মাকে কি বলিব? এ মুখ কি আর তাঁহার সম্মুখে বাহির করা উচিত? তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, নীরু! এতদিন পরে কি তোর বুড়ো মাকে মনে পড়িল।

তখন আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব। আমার বুকের ভিতর এইরূপ শত কথা আলোড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল,—সেই সময় জননীর পদ শব্দ সিঁড়িতে পাইলাম। সেই পদ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। আমি দ্বারের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না;—আপনা হইতে আমার মস্তকটা মেঝের দিকে নত হইয়া পড়িল। জননী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তাঁহার ম্লান মুখখানি আজ বড়ই গম্ভীর। তিনি আমার আগমন সংবাদ উমাচরণের মুখে শুনিয়াই উপরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিধানে তখনও সেই সিক্ত বসন,—তাহা হইতে টস্‌টস্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মা আমার উপর অভিমান করিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন,—আমার আগমন সংবাদ পাইয়া সেই অভিমানটা একেবারে মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি যে ভাবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম তিনি আমার সহিত আর কোন কথা বলিতেই প্রস্তুত নন্। কিন্তু আমার বিশুষ্ক মলিন মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সে অভিমান, সে জেদ্ রহিল না। জননী হৃদয় পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিল,—তিনি মহা চিন্তান্বিত স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁরে নীরু কি হয়েছে তোর! তোর চেহারা এমন কাহিল হয়ে গেল কি ক'রে। শক্ত অসুখ বিসুখ হয়েছিল বুঝি। তা আমায় একটু খবর দিতে নেই,—মায়ের

উপর কি অভিমান কর্ত্তে আছে বাবা? বল্ তুই ছাড়া আমার আর কে আছে?"

মায়ের কথায় আমার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িবার মত হইল। হায় এই মা,—যাহার স্বর্গীয় স্নেহ আমি দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহার নিষেধ অবিচলিত চিত্তে ঠেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম,—তিনি আমার শুধু মুখটা একটু বিষণ্ণ দেখিবা মাত্রই সব ভুলিয়া গেলেন। এই মায়ের আমি অবাধ্য হইয়াছিলাম এই কথা মনে হওয়ায় অনুশোচনা আমার বুকের ভিতর যেন মুদ্গর হানিতে লাগিল। কে যেন আমার ঘাড় ধরিয়া একেবারে আমাকে মায়ের চরণ তলে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিল। আমি তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, "মা, আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি,—তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার অবাধ্য হয়ে আমার প্রাণের সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আজ ঠিক দু'মাস কত জায়গায় ঘুরলুম কোথায়ও একটু শান্তি পেলুম না। মা মা, ছেলেবেলা থেকেই তো তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি, সবই যখন মাপ করেছ তখন এটাও ক্ষমা কর।"

আমার কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গিতে মা কি বুঝিলেন অন্তর্য্যামিই বলিতে পারেন,—কিন্তু আমার মাথা যে প্রকৃতিস্থ নহে তাহা বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিলেন। অতি স্নেহে আমার হাত ধরিয়া

আমাকে সেই মাদুরের উপর বসাইয়া দিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "নে স্থির হয়ে বোস। মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ হয় রে,—তুই আমার কথা না শুনে কলকাতায় চলে যাওয়ায় আমার যে দুঃখ হয়েছিল,—আজ তোকে দেখে সব দুঃখ আমার ঘুচে গেছে। সব সময়ে পাগলামি করা কি ভাল বাবা। নে এখন তেল টেল মেখে স্নান করে ফেলে দুটো ভাত খেয়ে একটু সুস্থ হ'। আমি কাপড় খানা ছেড়ে আহ্নিকটা করে আসি।"

মা আমাকে আর কোন কথা বলিবার অবসরটুকু না দিয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি উমাচরণকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "নীরুকে একটু তেল এনে দাও, আর ওর নাইবার জল ওপরে দেবার বন্দোবস্ত কর,—আমি যাই ওর দুটো ভাতের বন্দোবস্ত করিগে।"

উমাচরণ তৈল গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি স্নানের সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে স্নানের সরঞ্জাম গুলা একখানি চৌকির উপর রাখিতে রাখিতে বলিল, "ছোটবাবু তা'হলে জামাটা খুলে ফেল, নাইবার তেল টেল আমি সব এনেচি।"

আমার নিজস্ব আর কিছুই ছিল না, তাহার কথা মত আমি জামাটা খুলিয়া ফেলিলাম। সে তৈলের বাটীটা হাতে করিয়া লইয়া আসিয়া আমাকে তৈল মাখাইতে লাগিল। তৈল মাখা শেষ

হইলে আমি গামছা খানা হাতে করিয়া লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলাম। গৃহের সম্মুখে বারান্দা, সেই বারান্দার এক পার্শ্বে স্নানের স্থান। উমাচরণ পূর্ব্বেই তথায় জল রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সর্ব্বাঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ জল ঢালিয়া উত্তম করিয়া স্নান করিয়া ফেলিলাম। আজ এই দুই মাসের ভিতর মাথায় এক ফোঁটা জলও দিই নাই। দুই মাস পরে শীতল জল মস্তিষ্কে পড়ায় আমার মাথাটা যেন কতকটা ঠাণ্ডা হইল। স্নানের পর মা আমাকে আহারের জন্য ডাকিলেন। বহু দিন পেটে অন্নও যায় নাই। আমি অবনত মস্তকে আহারের স্থানে যাইয়া উপবিষ্ট হইলাম। অন্ন কয়টা উদরে দিয়া আজ আমার যে তৃপ্তি হইল এমন তৃপ্তি জীবনে আর কখন হইয়াছে কি না আমার মনে হয় না। আহার আমার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে সেই সময় মা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "এইবার একটা বিয়ে থা করে সংসারী হ'। বিয়ে থা না কল্লে কি মানুষ শান্তি পেতে পারে। যা ভুল হবার তা হয়ে গেছে। আর ভুল করে চির-দিনের মত ভবিষ্যৎটা একেবারে মাটা করে ফেলিস্‌নি। বিয়ে কল্লে তখন বুঝবি প্রাণে কত শান্তি পাওয়া যায়।"

মোহচক্র হইতেই আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম বটে কিন্তু মোহ তো তখন আমায় একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তখনও যে লীলার জন্য আমার প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

সেই নরক হইতে যে লীলাকে উদ্ধার করিতে পারি নাই সেই আক্ষেপটা তখনও যে শূলের মত নিশি দিন আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছিল। মায়ের কথায় আমি ঘাড়টা ঈষৎ নাড়িয়া উত্তর দিলাম, "মা আমি তোমার পায়ে ধরচ্চি বিয়ে কর্ত্তে আর আমায় কোন দিন অনুরোধ করো না। বিয়ে করার সাধ আমার ঘুচে গেছে। যত দিন বেঁচে থাকি তোমার কোলে একটু স্থান দিও, তারপর ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। বিয়ে আর আমি জীবনে কোন দিন কর্ব্বো না।"

মা আমার কথায় কি বুঝিলেন তিনিই জানেন। তিনি আর আমাকে কোন কথা বলিলেন না। সেই দিন হইতে আমি মায়ের নিকট কাশীতে রহিয়া গেলাম। আমি বাটী হইতে কখন কদাচিৎ বাহির হইতাম, দিন রাত্রিই একাকী বসিয়া লীলার চিন্তা করিতাম! এই ভাবে জননীর নিকট কাশীতে আমার দুই বৎসর কাটিয়া গেল। আমার প্রাণেও কতকটা শান্তি আসিল কিন্তু হায় বিধাতা আমার পাপে শান্তি লেখেন নাই, আমি কেমন করিয়া শান্তি পাইব। সেই সময় সহসা এক দিন হৃদরোগে জননীর মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পৃথিবীর সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। মায়ের মৃত্যু হওয়ায় আবার আমাকে দেশে আসিতে হইল। খুড়া মহাশয়ের শ্রাদ্ধের সময় আমি পুতুলের মত খাড়া ছিলাম কিন্তু জননীর শ্রাদ্ধ আমি নিজে দাঁড়াইয়া সম্পন্ন করিলাম। মায়ের শ্রাদ্ধের আমি

যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলাম সেরূপ শ্রাদ্ধ আমাদের গ্রামের আসে পাশে বিশ ক্রোশের ভিতর খুব কমই হইয়াছিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে ভিক্ষুক কাঙ্গালী পর্য্যন্ত সকলেই আমার ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গ্রামের মাতুব্বরগণ সকলকেই এক বাক্যে বলিতে হইল, "হাঁ নীরেন বাবাজি, মায়ের শ্রাদ্ধটা করেছ বটে,—হুঁ শ্রাদ্ধের মত শ্রাদ্ধ।"

* * * *

নানা গোলযোগে আরোও চারি পাঁচ মাস আমার দেশে কাটিয়া গেল। এই আড়াই বৎসরে, এত ঘটনার ভিতরও আমি লীলাকে একবারে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এই আড়াই বৎসর প্রাণে অসহ্য জ্বালা লইয়া আমি দিন রাত্র তাহারই চিন্তা করিয়াছি। আড়াই বৎসর পরে একটা কার্য্য উপলক্ষে আবার আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইল,—কলিকাতায় পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে লীলার স্মৃতিটা আবার আমার প্রাণের ভিতর তীব্র হইয়া উঠিল। লীলা এখন কোথায়,—এখন তাহার অবস্থা কিরূপ,—আমার কথা এখনও তাহার মনে আছে কিনা, এই সকল জানিবার জন্য ও কেবল একবার তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় আমার প্রাণ এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল যে বহু চেষ্টাও হৃদয়ের সে বেগ আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিলাম না। আড়াই বৎসর পর এক দিন রাত্রে

আবার আমি লীলাদের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে আমার পদদ্বয় একটু কাঁপিল বটে কিন্তু আমি জোর করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানের মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপরের বারান্দায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, তবে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই এইটুকু বুঝিলাম,—লীলার গৃহ হইতে হাসির তরঙ্গ ও গানের ফুয়ারা ছুটিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য আমি ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিঃশব্দে লীলার গৃহের দ্বারের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু গৃহের দরজা বন্ধ থাকায় ভিতরে কে আছে? বা কি হইতেছে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু তথায় চোরের মত অধিকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেও যেন কেমন আমার লজ্জা লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ সেই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিতেছিলাম সেই সময় একটা দমকা বাতাস আসিয়া গৃহের দরজাটা উন্মুক্ত করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি গৃহের ভিতর যাইয়া পতিত হইল। গৃহের ভিতর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। আমি দেখিলাম গৃহের ফরাশের উপর চারি পাঁচ জন লোক উপবিষ্ট,—সকলেরই চক্ষু সুরায় ঢুলুঢুলু করিতেছে;—তাহারই ঠিক মধ্যস্থলে লীলা! আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু,—আমারই সেই লীলা। তাহার এক হস্ত একজনের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে,—অপর হস্তে সুরার গ্লাস। সহসা দরজা

সশব্দে উন্মুক্ত হওয়ায় সকলেরই দৃষ্টি দরজার দিকে পতিত হইয়া ছিল। আমি দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলাম, লীলা চোখ তুলিয়া চাহিবা মাত্রই তাহার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তস্থিত সেই মদের গ্লাসটা সশব্দে ঝনঝন করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। গ্লাসস্থিত মদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল,—সমস্ত ঘর সুরার বিকট গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই দৃশ্যে, একটা কুৎসিৎ ঘৃণায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখিলাম। আমার মনে হইল তখনি ছুটিয়া যাইয়া লীলার গলাটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া চাৎকার করিয়া বলি, "ওরে পিশাচিনী তোর একি আচরণ! তোর সমস্ত দেহটাই কি ছলনায় গড়া।" কিন্তু আমি আর তথায় এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে পারিলাম না কে যেন আমায় ভিতর হইতে সবলে ধাক্কা মারিয়া একেবারে বাহিরে রাজপথে আনিয়া ফেলিয়া দিল। আমি সেই পাপপুরী হইতে দূরে,—বহু দূরে পলাইবার জন্য দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আমি পাগলের মত ঘুরিতে ঘুরিতে সেই পাপপুরী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গঙ্গায় তখন জুয়ার আসিয়াছে,—ভাগীরথী কূলেকূলে পরিপূর্ণ। রাত্রি তখন অনেকটা গভীর হইয়াছে,—গঙ্গার ধারে লোকজন বড় একটা নাই, আমি টলিতে টলিতে যাইয়া একটা জেঠির উপর বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ ভাগীরথী তীরে বসিয়া

থাকিবার পর সুশীতল সমীরণে আমি যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। সেই লীলার সহিত আলাপ হইবার প্রথম দিনের ঘটনা হইতে আগাগোড়া সব কথাই আমার মনে পড়িল। তখন আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যদি পবিত্র তীর্থ, কাশীতে মরিলে মানুষ শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে তখন এস্থানে জন্মিলে কেন না নারী পিশাচিনী হইবে। ইহাতে লীলাকে দোষ দিই মিথ্যা,— এ যে এই স্থানের মাহাত্ম্য।

হায় আমি প্রলোভনের টানে কেবলমাত্র সামান্য দিনের জন্য ওই স্থানে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহাতেই আমার এমন জীবনটা একেবারে অসার হইয়া গিয়াছে। সে স্থান যে কি ভয়ঙ্কর,— প্রলোভন যে কি মারাত্মক একটা শুধু আমার হৃদয়ের বুকভাঙ্গা নিশ্বাসে তাহারই একটু আভাস দিলাম।

সম্পূর্ণ।

লব্ধ প্রতিষ্ঠ উপন্যাসিক

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পালের পুস্তকাবলি।

১।	পাষাণে প্রাণ	(ছাপা নাই)	১৲
২।	বিয়ের হাসি	(সুরঞ্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
৩।	রঙ্গ-বারিধি		১৲
৪।	কুলবধূ		১৲
৫।	সতীর স্বর্গ		১।০
৬।	মিলন		১৲
৭।	ঘরের লক্ষ্মী		১॥০
৮।	সঙ্গিনী	(নারীনীতি)	১৲
৯।	একে আর	(মনোমোহনে অভিনীত)	।৵০
১০।	বিয়ের কনে		১॥০
১১।	বঙ্গবালা		১॥০
১২।	বিধির বিধি		১।০
১৩।	কালের কোলে		১৲
১৪।	গৃহ-বিচ্ছেদ		২৲
১৫।	প্রলোভন		১৲
১৬।	সমাজ-বিপ্লব		॥০
১৭।	ধর্ম্ম-পত্নী		২॥০
১৮।	সতীরাণী	(যন্ত্রস্থ)	১৲